পরিচর্যায় যখন কলব পরিচ্ছন্ন হয়, তখন পীরের মাধ্যমে স্রষ্টার ফজিলতে রব্বানি তথা এলমে লদুন প্রাপ্তিতে 'সাধারণ ইনসান' হয়ে ওঠে 'ইনসানে কামেলে'। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের উত্তরণ ঘটে। বাইরের খোলস পূর্বের মতে দৃশ্যমান হলেও ভেতরে ভেতরে ঘটে যায় মহা বিপ্লব– রূপান্তরিত হয়ে ওঠে খোদায়ি আলোকে পরিপূর্ণ আলোকিত মানুষে।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর দিগন্ত প্রসারীশত সহস্র কেরামতে[৫] আকৃষ্ট হয়ে এবং তাঁর প্রত্যক্ষ ফয়েজ প্রাপ্ত স্বনামধন্য খলিফাদের[৬] মাধ্যমে এই হেকমতি কৌশলে কত শত সহস্র ইনসান যে 'ইনসানে কামেলে' উন্নীত হয়েছেন তার কোনো গুণগত ও সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিসংখ্যান কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি। মৌলিকভাবে কলবে কলবে তথা সিনায় সিনায়[৭] এর লেনদেন বলেই পরিসংখ্যান[৮] করাটাও অসম্ভব। সামান্য কিছু মাত্র প্রকাশ্যে দৃশ্যমান হয়েছে সমৃদ্ধ মাইজভাণ্ডারী সাহিত্যে[৯]। যেমন : *আয়নায়ে বারী*, *তোহ্ফাতুল আখ্ইয়ার*, *ফকির উল্লাস* ইত্যাদি। তবে নিত্য প্রায় অহোরাত্রিক অনুশীলন ও চর্চার এবং একইসাথে ব্যাপক জনসম্পৃক্ততার কারণে মাইজভাণ্ডারী গানের ক্ষেত্রে এটির প্রকাশ বিকাশ বহুলাংশে দৃশ্যমান।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর অনুমোদনে মাইজভাণ্ডারী গানের আদি রচয়িতা মওলানা হাদী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি), তদীয় অগ্রজ মওলানা কাঞ্চনপুরী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি), আবদুল্লাহ বাঞ্ছারামপুরী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি), মওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) সহ সমসাময়িক কালের অনেকের মধ্যে এটি প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল থাকলেও লোক সঙ্গীতের বৃহত্তর পরিসরের সংস্পর্শে ও অভাবনীয় মেলবন্ধনের সাধারণ্যে ব্যাপকতর প্রকাশ বিকাশের ক্ষেত্রে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ হয়ে উঠেন 'মাইজভাণ্ডারের সাংস্কৃতিক দূত' কবিয়াল রমেশ শীল (১৮৭৭–১৯৬৭)।

সুনির্বাচিত ব্যক্তি বিশেষকে খোদায়ি এলমে লদুনির সরাসরি জ্ঞান দানের ক্ষেত্রে মৌলিক মাধ্যম হিসেবে হাক্কানি পীরের প্রভাব যে কোনো তুঙ্গীয় মাত্রিকতায় কার্যকর হয়ে ওঠে দৃশ্যমানভাবে তারই এক শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ কবিয়াল রমেশ শীল। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর আধ্যাত্মিকতা প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও খলিফা, কিংবদন্তির সাক্ষাৎ 'পরশ পাথর' 'নূরের পুতলা' হযরত বাবা ভাণ্ডারীর (১৮৬৫-১৯৩৭) এক পলকের নুরানি চাহনিতে প্রাতিষ্ঠানিক

শিক্ষা-দীক্ষা বর্জিত রমেশ শীল হয়ে ওঠেন 'মাইজভাণ্ডারের সাংস্কৃতিক দূত'। একই সাথে তাঁর তিনশতাধিক মাইজভাণ্ডারী গান হয়ে উঠেছে মহাসমুদ্ররূপী মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার উচ্চমার্গীয় দার্শনিকতাপূর্ণ তাত্ত্বিক অভিব্যক্তির তাৎপর্যপূর্ণ সাঙ্গিতিক বাহন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রমেশের সাঙ্গিতিক খ্যাতি ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা মাইজভাণ্ডারী দর্শনের সুস্পষ্ট প্রতিফলন, যা বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় এর 'গাউছিয়ত নীতি'রই সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

তথ্যসংকেত

১. কলব : সাধারণত কলব পরিবর্তনশীল। হাক্কানি কামেল পীরের শাহাদাত আঙ্গুলের স্পর্শ বা ইশারায় এটি জিন্দা বা চালু হয়ে যায়, স্বয়ংক্রিয়ভাবে। অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে পীর বা মুর্শিদের একান্ত দর্শন বা বিশেষ চাহনীতেই এই কলবে আল্লাহ্‌র জিকিরে জারি হয়ে যায়। 'গাউছিয়ত নীতি'র প্রবর্তকের ভ্রাতুস্পুত্র ও প্রিয়তম খলিফা হযরত বাবা ভাণ্ডারীর চাহনিও ছিল এ রূপ, যা রীতিমতো কিংবদন্তিতে পরিণত। সাধারণ্যে এর শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ কবিয়াল রমেশ শীল। তাঁর গানেই এই সত্যটি ফুটে উঠেছে উচ্চ মার্গীয় আধ্যাত্মিক মহিমায় :

খেদমতে হলে দাখিল এলমে লদুন হবে হাছিল
দোস্ত-দোষমন সমান হবে কীসের ভাবনা॥
কলব জিন্দা হয়ে যাবে মাবুদের দিদার পাবে
নিজের রূপ দেখিয়া হবি নিজে দিওয়ানা॥ (রমেশ পৃ.১৫৮)

২. রুহ : মানুষের শরীরের অভ্যন্তরে প্রতিস্থাপিত মহান রাব্বুল আলামিনের মহিমান্বিত নির্দেশ বিশেষ। পবিত্র কুরআনের সূরা হিজরের বর্ণনা মতে আল্লাহ মাটি দিয়ে মানুষকে তৈরি করার পর তার মধ্যে রুহ প্রতিস্থাপন করেন। রহমত সিক্ত রহস্য-ভরপুর এই রুহের রহস্যপূর্ণ সুগভীর তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে সূরা বনি ইসরাইলে ৮৫ নং আয়াতে এভাবে : তোমাকে ওরা রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলো, রুহ আমার প্রতিপালকের আজ্ঞাধীন। এতদবিষয়ে তোমাদের সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, কলব জারি হওয়ার সাথে রুহের কার্যকারিতার উৎকর্ষ সম্পূরক-পরিপূরক ভাবে সম্পর্কিত।

৩. এলমে লদুন : ঐশীভাবে প্রাপ্ত খোদায়ি জ্ঞানের নামই এলমে লদুন। তাসাউফের পরিভাষায় খোদা প্রদত্ত এমন বিশেষজ্ঞান যা শুধুমাত্র খোদার একান্ত ইচ্ছা ও মেহেরবানিতে বিশেষ নির্বাচিত ব্যক্তিদের এটি দান করা

হয়। এটি আবার অন্যের মাধ্যমে লেনদেনের বিশেষ ব্যবস্থাও রয়েছে। এর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে স্বয়ং হযরত মুসা নবি (আলাইহিস সালাম) কে হযরত খিজির (আলাইহিস সালাম) এর শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। পবিত্র কুরআনের সূরা কাহাফ এ এই এলমে লদুন জ্ঞান লেনদেনের বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। গাউছিয়ত ধারায় গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এবং তাঁর সুনিশ্চিত প্রতিনিধিদের খিদমতে দাখিল হলেও এই দিব্যজ্ঞান হাসিল হয়। যেমন দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত রমেশের ভাষায় :

মাইজভাণ্ডারে উঠেছে তৌহিদের নিশানা।
ঘুমাইওনা মায়া ঘুমে আখের জমানা।
খেদমতে হলে দাখিল এলমে লদুন হবে হাছিল
দোস্ত দোষমন সমান হবে কীসের ভাবনা।। (রমেশ পৃ. ১৫৮)

৪. আজরাইলের ছোঁয়া : মৃত্যুদূত আজরাইলের জানকবজ। মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে আজরাইলের উপস্থিত সময়ে বিন্দুমাত্র কোনো তর্ক-বিতর্ক আবেদন নিবেদনের সুযোগ দেওয়া হয়না। মানুষের মৃত্যুকালে এ এক মহাসংকট মুহূর্ত। কিন্তু মাইজভাণ্ডারের দোয়া-দয়া থাকলে এখানেও মিলে নির্ভয় ও নির্ভরতার আশ্বাস। এরই অবিশ্বাস্য নান্দনিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় রমেশের তুঙ্গীয় প্রত্যয়দীপ্ত আত্ম উপলব্ধিতে :

আমি কি মরণকে ডরি
আমার বুকের পাটা শক্ত আছে মালিক বাবা মাইজভাণ্ডারী।।
জন্ম-মৃত্যুর অধীন যারা তাদের জরুর হুঁশিয়ারী।
যেই দেশে নাই জন্ম মরণ সেই দেশে মোর বসত বাড়ি॥
আজরাইল যার আমিও তার দুইজন করি দুই চাকুরি
আজরাইল জান কবচ করে আমি করি তাবেদারি।।
মোরাকাবার মোশাহেদায় পীরের বরজখ থাকলে ধরি
রমেশ বলে আজরাইল এলে খোঁজে পায়না তার কোন বাড়ি।।
(রমেশ,পৃ ১৩৭)।

৫. গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী-র (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) জীবদ্দশায় তাঁর ৫০ বছর বয়সে তদীয় দিগন্ত প্রসারী কামালিয়ত (কেরামত) বিকাশের সূচনা পর্বে ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামে প্রলয়ংকরী তুফানের বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর

তুঙ্গীয় জনপ্রিয়তাসূচক ব্যাপক পরিচিতির চুম্বকসার বর্ণনা পাওয়া যায় লোককবি আহমদ আলী মিয়ার বড়ো তুফানের কবিতায় এ ভাবে-

মাইজভাণ্ডার, বিনাজুরী, কুতুবছড়ি, দমদমা- রায়পুর।
মৌলবী আহমদ উল্লাহ জান জগতে মশুর (মশহুর)॥

(আজ থেকে ১৪৬ বছর পূর্বে এটিই মাইজভাণ্ডার বিষয়ে প্রাচীনতম লিখিত তথ্য। সূত্র ড. সেলিম জাহাঙ্গীর রিসার্চ ফাউন্ডেশন আর্কাইভ।)

৬. গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) ওফাত (১৯০৬) স্মরণে তদীয় প্রিয় খলিফা, চার আমিনের অন্যতম আমিনুল হক হারবাংগিরী পয়ার ছন্দে দুটো কবিতার বই প্রকাশ করেন : ফকির উল্লাস (১৯০৭) ও ওফাতনামা (১৯০৮)। এতে বাংলা ভূখণ্ডের পাশাপাশি বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ও প্রভাব এবং একই সাথে এ ধারাকে প্রবহমান রাখার কৌশল হিসেবে এসব স্থানে তাঁর মনোনীত খলিফাদের (সাগ্রেদ) বিষয়ে অনেক অজানা তথ্য-উপাত্ত ফুটে উঠেছে লেখকের নিরাভরণ বর্ণনায় :

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী খোদার ভাণ্ডার
খোদার প্যারা (পেয়ারা) মাইজভাণ্ডারী২ সারি সারি নানান দেশে২
কামেল সাগ্রিদ (খলিফা) বসাইছে মন সুখে ॥
কত আলেম কত মৌলানা২ করে বিড়ানা (সর্বস্বান্ত) ইদ্দিত নয়নে।
কাজী মুপ্তি (মুফতি) না এর নবাব ভ্রমায় স্থানে২॥

(ফকির উল্লাস, উদ্ধৃত মাইজভাণ্ডারী সন্দর্শন, ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, বাংলা একাডেমি, ঢাকা পৃ : ৩৩৬)

৭. সিনায় সিনায় লেখাপড়া : 'সিনা' অর্থ বক্ষ বা হৃদয়। জাগতিক জীবনে কাগজে কলমে লেখা-পড়ার ঊর্ধ্বে হৃদয়-হৃদয়ে লেখাপড়া; জ্ঞান আদান-প্রদান। তাসাউফের পরিভাষায় লোক চক্ষুর অন্তরালে আধ্যাত্মিক জ্ঞান-প্রজ্ঞার আদান প্রদান, যা সাধারণ পীর-মুরিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

মাইজভাণ্ডারে হযরত বাবা ভাণ্ডারীর মারফত এই দিব্যজ্ঞানে ঋদ্ধ রমেশ শীলের ব্যক্তিগত উপলব্ধির কথাগুলো রীতিমতো তথ্য চিত্রের মতো ফুটে উঠেছে তাঁর যত্নকৃত নান্দনিক পরিচর্যায় :

চলরে মন ত্বরাই যাই, বিলম্বের আর সময় নাই
গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী স্কুল খুইলাছে ॥
আবাল বৃদ্ধ নরনারী, করে সবে হুড়াহুড়ি

নাম করে রেজিস্টারি ভর্তি হইতাছে ॥
সেই স্কুলের এমনি ধারা, বিচার নাই জোয়ান বুড়া।
সিনায় সিনায় লেখাপড়া শিক্ষা দিতাছে
মাস্টার ও মাহিনা ছাড়া, এলমে লদুনি পড়া
কাগজ কালি দোয়াত কলম কী দরকার আছে ॥
নফছানিয়তে ভাগ-বিয়োগ, রুহানিতে পূরন-যোগ,
ঈমান সাহিত্য তার নির্দিষ্ট আছে।

(রমেশ, পৃ : ১৩৩)

'গাউছিয়ত নীতি'র মৌলিক-ভিত্তি ঈমান সাহিত্যকে কেন্দ্র করে মাইজভাণ্ডারী সাধন মার্গের অভাবনীয় অসামান্য তাৎপর্য বিষয়ে এই গান একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক।

৮. গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কর্তৃক তাঁর কামালিয়ত বিকাশের সূচনা পর্বে তদীয় খলিফা মওলানা অছিয়র রহমান চরণদ্বীপি (১৮৪০-১৯২০), যাঁকে তিনি মুরাদ হিসেবে আখ্যায়ন করে স্বীয় হুলিয়া মোবারক [শারীরিক অবয়ব] দান করে আনুষ্ঠানিকভাবে গদিতে বসার হুকুম দানে ধন্য করেছেন, তিনিও যে কত শত সহস্র ইনসানকে ইনসানে কামেলে উন্নীত করেছেন তারও কোনো পরিসংখ্যান আজ অবধি লিপিবদ্ধ হয়নি। বলাবাহুল্য, অন্যান্য শত সহস্র খলিফার ক্ষেত্রেও এই সত্য প্রযোজ্য।

৯. মাইজভাণ্ডারী সাহিত্য : ১৯০৪ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশিত আল্লামা ফরহাদাবাদীর *তোহ্ফাতুল আখ্ইয়ার*, যাতে স্বয়ং গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) স্বাক্ষর করে একে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিষিক্ত করেছিলেন; সেই থেকে ১৯০৭-১৯০৮ এ *ফকির উল্লাস*, *ওফাতনামা*, ১৯১০ এ রচিত *আয়নায়ে বারী*র ধারাবাহিকতার ২০২২ এই সুদীর্ঘ ১১৮ বছর সময়কালে মাইজভাণ্ডারের 'গাউছিয়ত নীতি'র আলোকে দুই শতাধিক গ্রন্থ, শত সহস্র সাময়িকী এই বিভিন্ন ভাষায় মাহাত্ম্যপূর্ণ 'গাউছিয়ত নীতি'র প্রকাশ-বিকাশ ঘটিয়ে আসছে নিরবচ্ছিন্ন ধারায়।

লেখক :
বিশিষ্ট মাইজভাণ্ডারী লেখক ও গবেষক
রিসার্চ ফেলো, ফিনিস একাডেমি, ফিনল্যান্ড

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি-অর্জনের ‘গাউছিয়ত নীতি’

✍ ড. মো. গোলাম রব্বানী

بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله الذي خلقنا وارسلنا خليفه مع القران و حبيب الله هوالسيد المرسلين ختم النبيين

اللهم اهدنا الصراط المستقيم وجعلنا من المؤمنين

من الشكور والعباد المؤمنين اشداء على الكفار ورحماء بيننا

قال ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها

خلوقه القران هذا حمد الرسول

إنه دليل عظيم على سيدنا محمد ﷺ

إنه شرط إيماننا وديننانإنه لا يضاهى

.لا تعني التنمية الاقتصادية أي شيء أو أي شخص ضار بالآخرين

العالم الحالي يتعرض لتهديدات الحرب العالمية! لماذا؟

"Happy the man is he who's content with what he has" defined by the poet Alexander pope regarding what makes a man happy; it's nothing apart from the ethics of 'Sufi philosophy' of Islam in illustrating the essence of the definition of ' happiness '!

আমাদের একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে প্রবৃদ্ধি অর্জন একটি অর্থনৈতিক সমীক্ষার বিষয়। যদিও কুরআন হাদিসের আলোকে একজন মানুষের সফলতা বিষয়ক দিক নির্দেশনা আখিরাত মুখী! শুধু “অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন” ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থনযোগ্য নয় যদি তা মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়!

হযরত গাউছুল আজম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজর জীবন দর্শন থেকে অনুমিত হওয়া যায় যে প্রকৃত

সফলতা ইহজাগতিক এবং পরকালীন সফল একজন মানুষ হিসেবে খোদার গুণে গুণান্বিত হওয়া।

"ফানা অনিল এরাদা" অর্থাৎ খোদায়ি ইচ্ছা শক্তির সাথে নিজেকে বিলীন করে দেওয়া অথবা নিজেকে নিমজ্জিত রাখাই 'গাউছিয়ত নীতি'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য!

উপযুক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবৃদ্ধি অর্থাৎ 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিষয়টি' যদি নিম্নোক্ত গাউছিয়ত দর্শনের সাথে সাজুয্য রেখে আর্থসামাজিক উন্নয়নের পথে চলা যায় তবে নিঃসন্দেহে তা ইতিবাচক উন্নয়নের সুফল বয়ে আনবে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'গাউছিয়ত নীতি'র দর্শনে যা পরিদৃষ্ট হয় আর তা হল :

"পরমুখাপেক্ষিতা বর্জন করা।"

"যাহা না হইলে চলে সেইরূপ কাজ কথাবার্তা বর্জন করা বা এড়াইয়া চলা! পরদোষ পরিহার করে চলা এবং নিজ দোষ অন্বেষণ করা যা সুফি পরিভাষায় 'তেলাওয়াতে অজুদ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে!"

সুফি পরিভাষায় 'রজা' এবং 'তাসলিম' মূলত বৈষয়িক, আত্মিক এবং পারলৌকিক সফলতা লাভের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে!

পবিত্র কুরআনে যারা 'সফলকাম' তাদের বর্ণনা রয়েছে স্পষ্ট আকারে এবং সফলকাম অর্থাৎ 'মুফলেহুন' مفلحون শব্দটি ১৩ বার পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে।

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١

২৩ নাম্বার সূরায় 'মুমিন' হিসেবে যাদের সফল বলা হয়েছে তাঁদের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট আকারে বর্ণনা করা হয়েছে; সেই সূত্রে যারা সীমালঙ্ঘন করে না এবং নিজেদেরকে 'অপ্রয়োজনীয় কথা কাজ' থেকে দূরে রাখে তাদের ও সফল বলা হয়েছে!

একই সাথে 'যাকাত' বা দান খয়রাত প্রদানে সচেষ্ট মানবতাবাদী ব্যক্তিরাও সফল বলে গণ্য করা হয়েছে।

সুতরাং গরিব, দুঃখী, অসহায় এবং যারা দান খয়রাত এবং আর্থিক সুবিধা পাওয়ার যোগ্য তাঁদের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্যই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি একটি অনিবার্য অবকাঠামো যা অস্বীকার করার উপায় নেই।

আমাদের জ্ঞান পরিসরে একটি প্রাচীন নীতিকথা ঘুরপাক খায় আর তা হলো "অর্থই অনর্থের মূল"!

অর্থবিত্তের অন্ধকার চেহারা অনেকের কাছে স্পষ্ট আবার অনেকের কাছে স্পষ্ট নয়।

কিন্তু আমাদেরকে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে সৃষ্টি কর্তা আমাদেরকে প্রাচুর্য বা ধনসম্পদ দিয়ে যেমন পরীক্ষা করছেন!

তেমনই অর্থ সম্পদের অভাব অপ্রাচুর্য দিয়েও পরীক্ষা করছেন!

অর্থাৎ ধন সম্পদ টাকা কড়ি অর্জনের জন্য মানুষ মাত্রই সামাজিক বাস্তবতায় নিবেদিত হওয়াকেই বাস্তবতা মনে করেন; কিন্তু এমন দারিদ্র্য প্রত্যাশিত নয় যা মানব জীবনকে নীতিভ্রষ্ট করে অথবা নীতিভ্রষ্টতায় পতিত হতে বাধ্য করে!

দারিদ্র তাদেরকে মহান করেছে অর্থাৎ দারিদ্র্যের কশাঘাত যাদের সততায় বিন্দুমাত্র কলঙ্কের দাগ আনতে পাওে না তারাই তো ধনী লোকদের পাঁচ শত বছর পূর্বে বেহেশতে গমন করবেন বলে হাদিসে ঘোষিত হয়েছে।

অর্থের অনিবার্য বাস্তবতার নিরিখে মানব সমাজের প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি অনস্বীকার্য।

কিন্তু অর্থই মানব জীবনের সব কিছু নয়!

সেই সূত্রে 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন' সবকিছু নয় বিষয়টি একই সমান্তরালে চলে যদি তা সমাজ বাস্তবতায় মানব জীবনের সৌন্দর্য এবং শান্তি উপভোগে তার সঠিক ব্যবহার না হয়! অর্থের সদ্ব্যবহার না হয়!

'গাউছিয়ত নীতি' মূলত মানব জীবনে এবং ইহজাগতিক, সামাজিক, পারিবারিক জীবন যাপনে সেই সৌন্দর্য এবং শান্তি উপভোগে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

'অল্পে তুষ্টি থাকা' সাহাবায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওবায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গায়ে একটি কুর্তা (আরবদের বিশেষ পরিধেয় বস্ত্র) দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এই কুর্তা তুমি কত দিয়ে খরিদ করেছো? আমি উত্তরে বললাম, "বারো দেরহাম দ্বারা!"

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, "তোমার নাশ হোক!" ছয় দেরহামে কেন খরিদ করলে না? অতিরিক্ত দেরহাম তোমার জানা মতে অন্য প্রয়োজনে খরচ করতে পারতে!"

এই ছিল আমাদের প্রিয় নবিজি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গী সাথিদের জীবন আচরণ এবং অর্থনৈতিক ব্যয় সংকোচনের সাধনায় পরিচালিত অর্থ ব্যয় সংকোচনের পন্থা!

হযরত আবু জাফর রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, একদিন হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শুষ্ক কয়েকটি খেজুর খেয়ো পানি পান করলেন। তারপর আপন উদরের উপর চাপড় মেরে বললেন, "যার পেট তাহাকে আগুনে (দোযখে) প্রবেশ করায় আল্লাহ তাকে তাঁর রহমত হইতে দূরে রাখেন!"

অতঃপর এই কবিতা আবৃত্তি করলেন : "তুমি যখনই তোমার পেট এবং লজ্জাস্থানের বাসনা পূরণ করবে তখনই এরা উভয়েই চূড়ান্ত দুর্নাম অর্জন করবে।"

হযরত আলি রাদিআল্লাহু আনহু আরও বলেন, "হে আদম সন্তান! তুমি আজকের দিনে আগামীকালের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হয়ো না!" (সূত্র : হায়াতুসসাহাবা পৃ : ১৬৩, ১৬৪)

লোভ- লালসা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উচ্চাভিলাষ পরিহার তথা ষড়-রিপুর আক্রমণ বিমুখ জীবনের লক্ষ্যে পরিচালিত মানব আত্মার পরিশুদ্ধতা, বিশুদ্ধতা এবং মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আধ্যাত্মিক সাধনার সহায়ক বিষয়টি 'গাউছিয়ত নীতি'তে স্পষ্ট!

মানুষের নফ্স, মন বা হৃদয়-মানস নানামুখী কামনা, আকাঙ্ক্ষা, এবং ইচ্ছা পূরণের বাসনায় আকৃষ্ট হয়; কিন্তু সেই ইচ্ছা, আশা, কামনা- বাসনা যখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে চালিত হয় তখন নিঃসন্দেহে তা নেতিবাচক পরিণতির দিকে ধাবিত হবে এটি স্বাভাবিক!

কেননা উদ্দেশ্য এবং নিয়তের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রায়োগিক অথবা বাস্তবায়নের বিষয়টি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে জড়িত।

অর্থনৈতিক সূত্রের 'চাহিদা এবং সরবরাহের নীতিটি' অর্থনীতিবিদ মাত্রই জ্ঞাত রয়েছেন!

কিন্তু মানব চাহিদার বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত না হলে 'অন্তহীন সরবরাহ' কোনো ইতিবাচক সমাধান আনতে পারে না!

'অর্থের অপচয়' তথা 'অর্থ সম্পদের অপব্যবহার' এবং সঠিক প্রকল্পে বিনিয়োগে মানবসম্পদ তথা অর্থ সম্পদের সঠিক ব্যবহার-ব্যর্থতা কোনো সফল পরিণতির নিদর্শন নয়!

এজন্য 'গাউছিয়ত নীতির আলোকে' সেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সফলতা কাম্য যা অর্জনে এবং সংরক্ষণে আমাদের জীবন যাপনে উচ্চাভিলাষ, অপচয়, অর্থের আত্মসাৎ, অর্থের অসদ্ব্যবহার, আত্মস্বার্থ, স্বজন প্রীতি, এ জাতীয় নানাবিধ অপকর্মের কারণ যাতে কোনেভোবেই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আক্রমণ না করে অর্থাৎ 'গাউছিয়ত নীতির পরিপন্থি' না ঘটে অর্থাৎ কোনো নেতিবাচক ধারায় অর্থনৈতিক বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক কর্ম সম্পাদন পরিলক্ষিত না হয় সেই শিক্ষা এবং দীক্ষা গাউসুল আজম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ এর জীবন আচরণে প্রতিফলিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআন হাদিসের আলোকে অর্থের অপচয়কারীকে 'শয়তানের ভাই' হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

সুতরাং অনর্থক অর্থ অপচয়ের বিষয়টি কত ন্যক্কারজনক ভাবে ঘৃণিত তা কারোও কাছে অজ্ঞাত নয়।

তাই "অর্থনৈতিক প্রবৃত্তি অর্জনের বিষয়টি" ভালো কাজ অথবা ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিধায় 'গাউছিয়ত নীতি' মূলত সমস্ত রকম নেতিবাচক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে।

পবিত্র কুরআন বলে :

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ﴿۳﴾

অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের ভাষায় বিশ্বাসী বান্দাদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ভালো কাজে বা পন্থায় নিজের সৎ উপার্জন অথবা অর্জিত ধন-সম্পদ ব্যয় করা। (সুরা বাকারা : ৩)

যত ভালো কথা পবিত্র কুরআনে তা যেমন সদকা হিসেবে পরিগণিত।

তেমনই সকল প্রকার ভালো কাজ এবং সুকাজে, সুপন্থায়, সৃষ্টির সেবায় জনকল্যাণে অর্থ বিনিয়োগ এবং অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি প্রকৃত বিশ্বাসীদের কর্মকাণ্ড হিসেবে পবিত্র কুরআনে 'সূরা বাকারায়' উল্লেখ করা হয়েছে শুরুর দিকে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিষয়টি অবশ্যই 'আখরাতমুখী' হওয়াটাই ইসলামের প্রথম নির্দেশনা অর্থাৎ অর্থনৈতিক অগ্রগতি, উন্নয়নের প্রবৃদ্ধি যেন কোনোক্রমে আমাদেরকে 'আখিরাতে বিমুখ' না করে অর্থাৎ মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত জীবনের সুখানন্দের স্থায়িত্ব কে যেন আমাদের সামনে কোনো ভাবেই ম্লান না করে সে সম্বন্ধে প্রতি মুহূর্তে সজাগ থাকা আবশ্যক!

দুনিয়ার ভোগ বিলাস আনন্দ-ফুর্তির মাঝে এ বিষয়টি আমাদের জীবন চলার পথে সার্বক্ষণিক স্মরণ রাখা কর্তব্য যা 'গাউছিয়ত নীতি' অবলম্বনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হওয়া সম্ভব।

কেননা আমাদের দয়াল নবিজি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার ভোগবিলাস আনন্দ ফুর্তি যেন আমাদের কোনোক্রমেই গ্রাস না করে এজন্য তিনি নিজের জীবনাদর্শে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে নিজের জন্য অথবা পরিবারের জন্য কোনো কিছু সঞ্চিত রাখতেন না ।

বরং সবকিছু দান খয়রাত এবং মানব সেবার কাজে ব্যয় করতেন এবং এই পরার্থে আমাদের সৎ আয়- উপার্জন, ধন-সম্পদ ব্যয়ের প্রতিশ্রুতির চর্চা আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য হিসেবে চালিত হওয়ার শিক্ষাই আমাদের পারস্পরিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হতে পারে!

মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত জীবনের প্রতি উদাসীন থেকে এ পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত জীবন যাপনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার রীতি আমাদের কে ক্ষণস্থায়ী এই জীবন যাপনের দুনিয়ার চাকচিক্যে নিমজ্জিত করে থাকে বলে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে।

সেজন্যই ভোগ-বিলাস নয়, অর্থবিত্তের লোভ দেখানো শোডাউন নয়, জাগতিক আনন্দ ফুর্তির ভাগাড়ে নয়, পারস্পরিক নেতিবাচক ধ্বংসাত্মক অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার পথে নয় বরং একজন 'সাধারণ মুসাফির' এর মতোই পরিচালিত হওয়ার মতো জীবন যাপনের আবশ্যিক উপকরণ সংগ্রহই আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে চালিত হওয়ার শিক্ষাই ব্যক্তি সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় বাস্তবায়িত হাওয়াই প্রত্যাশিত।

In the same way the 'Sufi community' and those who came to be enlightened with ideals of 'Sufism' are supposed to be inspired by the practices of the Saints of

our Islamic history leading their lives as per the passion and longing to enjoy the eternal blessings of the world hereafter!

They never believe in adorning the so called ostentatious, flamboyant, showy lifestyle on earth having no rapport with the tasks and instructions of those who have been honoured as the best of the mankind in the eye of the Almighty!

We have been asked to follow their values and ideals because they belong to the ways ascertained and approved by the Greatest Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

'Gausiat Principles' promote people to be enlightened with the philosophy of leading life on earth helpful and peaceful for all.

There must not be any ambitious project, useless financial involvement, wastage of resources and funds leading people to use the economic growth in enjoying meaning less materially voluptuous life devoid of spiritual growth of human soul.

Enlightenment of the human soul which is the prerequisite to ensure peaceful, sustainable and humanitarian life style in the real sense of the term is recommended to lead our life on earth.

If we look around our existing present world we will see how economically solvent nations are getting globally entangled in the negative trends.

They are concerned with issues bringing nothing positive but chaos and conflicts among the nations!

It's easily noticed that they are investing every economic output in prolonging their egoistic desires and nothing else when millions of dollars are being spent in the purchase of weapons destructive for the existence of the whole mankind.

And this is the consequence of the 'negative impact' of hoarding immense economic power because when anyone thinks superior to others and economically more powerful than others; they're prone to show simply their pomp and pride, self-aggrandizement , egoistic influence of their undue destructive powers causing nothing positive for the peaceful, sustainable human life in the world!

দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের জন্য শস্যক্ষেত্র বলা হয়েছে এবং একই সাথে আমাদের অনন্ত জীবন পথের যাত্রায় নিজের সম্বল নিজেদের আয়ত্ত করতে হবে। যার জন্য প্রয়োজন আমাদের জীবন যাপনে আত্ম নিয়ন্ত্রণ, শুদ্ধাচার এবং বিশুদ্ধ আত্মা অর্জনের দর্শনের আলোকে আমাদের সৃষ্টিকর্তা খোদার সন্তুষ্টি লাভের আশায় নবিজির মহব্বতে এই পৃথিবীর অতি সংক্ষিপ্ত জীবন যাপনের উপকরণ ব্যয় পরিচালিত করার মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো।

যেহেতু সৃষ্টিকর্তার কাছেই ফিরে যেতে হবে আমাদের এবং তাঁর নিকট জবাবদিহিতার বিষয়টি অনিবার্য!

এজন্যই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, "আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে কম হাসতে, বেশি করে কাঁদতে।"

'গাউছিয়ত নীতি' আমাদের শেখায় আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক, জাগতিক চাহিদার প্রয়োজনে যতটুকু আর্থিক সমৃদ্ধি এবং মানসম্মত জীবন যাপনের উপকরণ প্রয়োজন ততটুকুই আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মাপকাঠি; এবং যেকোনো ধরনের বিলাসী জীবন যাপন, অহেতুক ভোগ বিলাসের পরিণতি কখনোই ইতিবাচক হয় না তা ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সহজে সকলের নিকট পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। মানব সভ্যতার সুপ্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি তার উৎকৃষ্ট হাজারো দৃষ্টান্ত চক্ষুষ্মানদের নিকট সুস্পষ্ট!

'গাউছিয়ত নীতি' আমাদের জীবন পথের সেই আলোকবর্তিকাই নির্দেশ করে।

লেখক :
বিভাগীয় প্রধান , ইংরেজি বিভাগ
মোহাম্মদপুর সরকারি কলেজ, ঢাকা।

‘ফানা আনিল এরাদা’র অনুশীলন মানবমনে স্রষ্টানুরাগ জাগ্রত করে এবং স্রষ্টার নৈকট্য লাভে ধন্য করে

✍ কাজী মোহাম্মদ কামরুল আহছান

সুফিবাদ ইসলাম ধর্মের এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়। উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফিসম্রাট গাউছুল আজম শাহসুফি মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) [১৮২৬–১৯০৬] কর্তৃক প্রবর্তিত সুফিবাদের প্রসিদ্ধ ধারা হলো মাইজভাণ্ডারী তরিকা। তিনি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য তরিকতের ধারায় জাগতিক ও আত্মিক উন্নয়নের সহজসাধ্য মাধ্যম হিসেবে প্রসিদ্ধ ‘উছুলে ছাবয়া’ বা সপ্ত পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন। যা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পার্থিব প্রশান্তির অন্যতম উপায়। সাধারণ মানুষের ধারণা হচ্ছে তরিকত মানে জাগতিক বিষয় বর্জন করে কেবল পরকালীন চিন্তায় বিভোর থাকা। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) ‘উছুলে ছাবয়া’র প্রবর্তন করে এ ভুল ধারণার খণ্ডন করেছেন। তিনি এ অনন্য পদ্ধতির দ্বারা জগৎবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, সুফিবাদের চর্চা মানে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি অর্জন। মূলত; তিনি আধ্যাত্মিক মহাশক্তি অর্জনের মাধ্যমে বেলায়তের সর্বোচ্চ আসনে আসীন হয়ে ব্যাপক মর্মার্থবোধক ও প্রভাব বিস্তারকারী এ সপ্ত উছুলের নির্দেশ করেছেন।

হযরত কেবলার এ সপ্ত পদ্ধতি দু’ভাগে বিভক্ত– (১) ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ পদ্ধতি, সেগুলো হচ্ছে– (ক) ফানা আনিল খাল্ক, (খ) ফানা আনিল হাওয়া (গ) ফানা আনিল এরাদা। ২। মউতে আরবা’ বা চতুর্বিধ মৃত্যু।

‘ফানায়ে ছালাছা’র অন্যতম প্রকার ‘ফানায়ে এরাদা’ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করার প্রচেষ্টা করবো। ‘ফানা’ ও ‘বাকা’ হচ্ছে সুফিবাদের দুটি প্রসিদ্ধ পরিভাষা এবং এ দুটো হলো সুফিবাদের মৌলিক স্তর। ‘ফানা’ শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ বিলীন হওয়া, নিঃশেষ হওয়া, ‘ফানা’

বলতে বোঝানো হয়েছে তন্ময়তার মাধ্যমে আত্মসচেতনতা বিস্মিত হয়ে ঐশী চেতনায় উন্নীত হওয়া।

এ স্তরে সুফিসাধকগণ জাগতিক কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে ঐশী সত্তায় প্রদীপ্ত হন এবং নিজেদেরকে সর্বতোভাবে আল্লাহ্‌র প্রেমে সমাহিত করেন। এ ফানা স্তরের পর সূচিত হয় 'বাকা' তথা স্থায়ী। এ স্তরে সাধক আল্লাহ্‌র চেতনায় স্থায়িত্ব লাভ করেন। সুফিতত্ত্বের ভাষায় 'ফানা আনিল এরাদা' হচ্ছে বান্দা নিজস্ব ইচ্ছা ও কামনা-বাসনা পরিহার করে নিজের সকল ইচ্ছাশক্তি ও সামর্থ্যকে সৃষ্টিকর্তার প্রতি সোপর্দ করে নিজেকে বিলীন করে দেওয়া। সুফিতত্ত্বে যাকে তাসলিম ও রযা নামে অবহিত করা হয়। সুফি সাধনার পথ পরিক্রমার অন্যতম শর্ত তাসলিম বা আত্মসমর্পণ। আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ ব্যতীত আধ্যাত্মিক জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ হবে না। আত্মসমর্পণের ফলে অহংবোধ লোপ পায়; পরম আরাধ্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বিলীনতা ও প্রকাশ পায়।

সুফি সাধনায় পূর্ণতা লাভ করতে হলে বাহ্যিক শুদ্ধতার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বিশুদ্ধতা অপরিহার্য। আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন :

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ﴿١٤﴾

অর্থ : "তারাই প্রকৃত সফল হলো, যারা আত্মশুদ্ধি অর্জন করলো।" (সুরা আ'লা : ১৪)

আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য نفس বা আত্মাকে পরিপূর্ণ প্রশান্ত করা আবশ্যক। সুফিবাদে আত্মার তিন অবস্থা–

(১) নফ্‌সে আম্মারাহ, (২) নফ্‌সে লাওয়ামাহ (৩) নফ্‌সে মুৎমায়িন্নাহ। নফ্‌সে আম্মারাহ কে বশে এনে নফ্‌সে লাওয়ামাহ স্তরে নেওয়া। সাধনা করে একে নফ্‌সে মুৎমায়িন্নাহ স্তরে পৌঁছানো। এ স্তরে পৌঁছলেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করতে সমর্থ হয়।

"ফানা আনিল এরাদা"র মূলতত্ত্ব হচ্ছে : ইবাদতে একনিষ্ঠতার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জনপূর্বক পরমুখাপেক্ষিতা বর্জন করে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র প্রতি নিমগ্ন হওয়া। এ ধারার অনুশীলন মানুষকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি নিমগ্ন করে দেয়। ইবাদতের একনিষ্ঠতার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ এরশাদ করেন,

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ

অর্থ: "তাদেরকে শুধু একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" (সুরা বাইয়িনাহ : ৫)

"ফানা আনিল এরাদা" অর্জনের জন্য বান্দাকে পরিপূর্ণরূপে তাকওয়া (খোদাভীতি) ও তাওয়াক্কুল (আল্লাহ্‌র উপর ভরসা) অর্জন করা অপরিহার্য। মহান রাব্বুল আলামিনের এ বাণীকে সর্বদা চোখের সামনে রাখতে হবে :

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ

অর্থ : "এবং যে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।" (সূরা ত্বালাক্ব, আয়াত : ৩)

স্বীয় 'এরাদা' বা ইচ্ছাশক্তিকে বর্জন করা তাসাউফের তিনটি স্বভাবের মধ্যে একটি; যেমনটি সুফি আল্লামা রুওয়াইম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেছেন: "তাসাউফের ভিত্তি তিনটি স্বভাবের উপর (১) দারিদ্রের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত থাকা। (২) দানশীলতা ও ত্যাগের ব্রতকে নিশ্চিত করা। (৩) স্বীয় ইচ্ছা (এরাদা) কে বর্জন করা। সূত্র : [জিয়াউল কুলুব, কৃত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বঙ্গানুবাদ, পৃষ্ঠা-২৬]

ইমাম গাজ্জালি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন : "তাসাউফের মূলকথা হলো অন্তরকে সম্পূর্ণ মহান আল্লাহ্‌র জন্য বাধিত করা ও গাইরুল্লাহ্ থেকে মুক্ত রাখা। এতে পার্থিব জগতে বিচরণ করলেও ধ্যানধারণায় সর্বদা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি হয়।

হযরত যুন্‌নূন মিস্‌রি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন : প্রকৃত আরেফ হলো "যিনি সুখলোকে বসবাস করেন; অথচ সুখলোক থেকে পৃথক থাকেন।" [সূত্র. মুসলিম দর্শন পরিচিতি, কৃত: ড. আব্দুল হামিদ, পৃ: ৮৬)

হযরত কেবলা গাউছে মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)' র "ফানা আনিল এরাদা"র মর্মও এটা। মূলত' মানুষের নিজের ইচ্ছাশক্তিকে বিলীন করে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সোপর্দ করার স্তর অতিক্রম না করলে প্রকৃত সাধক হওয়া অসম্ভব। প্রখ্যাত সুফি হযরত আবুল হাসান নুরি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন :

اَلصُّوْفِىُّ لَا يَمْلِكَ وَلَا يُمْلَكَ

অর্থাৎ- "সুফির কব্জায় কিছুই নেই, সুফি ও কারও কব্জায় নয়।"

হযরত শিবলি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন,

الصُّوفِى لَا يَـرَى فِى الدَّارَيْنِ مَعَ اللّٰهِ غَيْرَ اللّٰهِ .

অর্থাৎ "সুফি হচ্ছে তিনি, যিনি দু'জাহানে জাতে ইলাহি ভিন্ন অন্য কিছু না দেখে।" [সূত্র. কাশফুল মাহজূব, কৃত- দাতা গঞ্জে বখ্শ, লাহোরি, পৃ. ৭১–৭৪] কেননা মানুষের ইচ্ছা অনুযায়ী কোনো কিছুই হয় না, যা রাব্বুল-আলামিনের ইচ্ছা (মন্শা) তা-ই হয়। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন :

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٩﴾

অর্থ : তোমরা যা ইচ্ছা করো তা নয়, বরং আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী সবই হয়। (সুরা তাকবির : ২৯) বান্দা আপন ইচ্ছাশক্তিকে বিলীন করে খোদায়ি এরাদার উপর যখন তাওয়াক্কুল করে, তখন খোদার প্রতি অনুরাগ-ভরসার মনোনিবেশ সৃষ্টি হতে থাকে। সুফিদের ভাষায় এটাকে رضا 'রজা' বলা হয়। এ অবস্থার পর স্রষ্টার রিয়াজতে নিমগ্ন হয়ে স্রষ্টার নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। হযরত আবুল আব্বাস বিন আতা (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন,

الرضا نظر القلب الى قديم اختيار الله للعبد

অর্থাৎ, বান্দার উপর আল্লাহ্র আদি এখতিয়ারের প্রতি অন্তরদৃষ্টি থাকাকে রজা বলা হয়। সর্বান্তঃকরণে মেনে নেওয়া যে, আল্লাহ্র আদি ইচ্ছা ও হুকুমের ভিত্তিতে এটি আমার জন্য নির্ধারিত। [কাশফুল মাহজুব, পৃ. ২৬০] হযরত হারেস মহাবেসি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন :

الرضا سكون القلب تحت جريان الاحكام

"আহকামে ইলাহি জারির উপর কলবের সন্তুষ্টির নাম হচ্ছে রজা।"

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হলো যে, "ফানা আনিল এরাদা" সূফি সাধনা-র এক গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এটি স্রষ্টার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। কুরআন-হাদিসের নির্যাস হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. আল্ কুরআনুল করিম।
২. কাশফুল মাহজুব, কৃত- দাতা গঞ্জে বখ্শ আলি হাজবিরি লাহোরি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি)।
৩. জিয়াউল কুলুব, কৃত- হযরত হাজি এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি)।
৪. মুসলিম দর্শন পরিচিতি, কৃত- ড. আব্দুল হামিদ ও ড. মুহাম্মদ আব্দুল হাই ঢালী।
৫. উছুলে ছাবয়া, দারুল ইরফান রিসার্চ ইনষ্টিটিউট।

লেখক :
অধ্যক্ষ, মাজহারুল উলুম গাউছিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা
নানুপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

নিরবদ্য জীবন গঠনে 'ফানায়ে ছালাছা'র ভূমিকা

✍ মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান আলকাদেরী

নিখিল বিশ্বের সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। সৃষ্টিকুলের সৃষ্টির সংখ্যা অজানা এক তথ্য। অসংখ্য ও অগণিত এই সৃষ্টির মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট দান করেন মানবজাতিকে। এটা মহান রবের বিশেষ এক দয়া ও মায়া; আবার তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার শক্তি ও হিদায়াতের আলোতে উদ্ভাসিত হবার ক্ষমতা দান অনন্য এক করুণা ও মেহেরবাণি। যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য বনি আদম সিরাতে মুসতাকিম তথা সঠিক পথের পথিক ও মহান রবের একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের ওপর ঈমান এনে ঋদ্ধ জীবন গঠন করা, যাতে করে আল্লাহ্ ও রাসুল বান্দার ওপর পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির দৃষ্টিপাত করেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সকল নবিদের পরে শেষ নবি হিসেবে পৃথিবীর বুকে শুভাগমন করেন মহান রবের প্রিয় হাবিব, সকলের মুক্তির কান্ডারি দয়াল, নবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বিশ্ববাসীর সম্মুখে ইসলামের মহান বাণী ও ধর্মের অবিনাশী চেতনা তুলে ধরেন বিশ্ব মানবতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

দয়াল নবির পবিত্র দ্বীনি দাওয়াতের ফলে ঘোর অন্ধকার যুগের মানুষ পরিণত হয় আলোকিত মানুষে ও লাভ করেন নিরবদ্য জীবন যাঁদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয় সাহাবি হিসেবে তামাম বিশ্বে। প্রিয়নবির পরিপূর্ণ আদর্শ ও প্রেম-ভালোবাসা মনের মুকুরে ধারণ করে কর্মময় জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনির্বাণ জীবন করেন সাহাবায়ে কেরাম। সারা বিশ্ববাসীর জন্য হয়ে ওঠেন রোল মডেল। এই সোনালি মানুষগুলোর সংস্পর্শ ও সোহবতে গড়ে ওঠে বিশ্বজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন তাবিগণ, পরে তাবে-তাবিগণ। সেই থেকে ইসলামের অবিনাশী চেতনার দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব অর্পিত হয় মহান অলি-আউলিয়া ও কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানে টুইটম্বুর উলামায়ে কেরাম নবির ওয়ারিশদের ওপর।

মানবতা ও কল্যাণময় ধর্ম ইসলামের বাণী সকলের নিকট পৌঁছে দেওয়ার মানসে তিল-তিল, শ্রম-মেধা ঘামে চষে বেড়ান পৃথিবীর নানা অঞ্চলে ইসলামি মনীষীগণ। এ ক্ষেত্রে কাদেরিয়া তরিকাসহ অন্যান্য তরিকার অবদান অনস্বীকার্য। এ যেন মরুর ভিতর শুরু করেন সমুদ্র সৃষ্টির লড়াই। যুগের চাহিদা সময়োপযোগী কৌশল অবলম্বন করে লক্ষ্য স্থির করে বিপরীত স্রোতে সাঁতার কেটে ইসলামের তরি নিয়ে যান সোনালি বন্দরে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ। তাঁদের দেখানো পথেই হাঁটছেন আলোর পথযাত্রীরা এখনও। ফলে এ মিশনের অনুসারীগণ এমন গুণমুগ্ধ ও মানবিক মানুষরূপে গড়ে ওঠেন, যাদের শেষের ভিতরও আছে অশেষ। মহান রবের নির্দেশিত, দয়াল নবির প্রদর্শিত সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত ও আউলিয়া কেরামের পরিচালিত ইসলামের সঠিক দর্শন-আকিদা, বিশ্বাস ও কর্মপন্থা সমন্বয়ে যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিশ্বসমাজে তুলে ধরেন অভিযোজনে কৌশল ও দুর্নিবার প্রক্রিয়া হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ। উদ্ভাবিত এ তত্ত্বের নাম 'ফানায়ে ছালাছা' বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ পদ্ধতি। বস্তুত বিশ্ব মানবতার মুক্তি, দু'জাহানের সাফল্য, ইনসানে কামেল হওয়ার পরকাষ্ঠা জীবনের লক্ষ্যে, সর্বক্ষেত্রে তাকওয়া ভিত্তিক জীবন গঠনের নিমিত্ত কুরআন-সুন্নাহ-র নিরিখে উৎসাহিত হওয়ার জন্য প্রবর্তিত ও উপস্থাপিত 'ফানায়ে ছালাছা' বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ এর এই ফর্মুলা। যেই 'ফানায়ে ছালাছা' ফর্মুলা অবলম্বন ও আত্মস্থ করে একজন মানুষ বিকশিত হবে প্রদীপ্ত সূর্য রশ্মির মতো। আর সমাজ হবে জান্নাতি পরিবেশের। আমি মনে করি, তরিকত নিয়ে সমালোচনাকারীর সমালোচনার বার্তাগুলোকে কফিনবন্দি করে দিলেন হযরত কেবলা এ পদ্ধতির মাধ্যমে।

আধ্যাত্মিকতার শিখর স্পর্শকারী, শুদ্ধাচারী-ধর্মপ্রচারক, ধর্ম তত্ত্ববিদ, দার্শনিক হযরত কেবলা শব্দগত সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক মর্মার্থবোধক কতিপয় মূলনীতি তথা 'ফানায়ে ছালাছা' প্রবর্তন করেছেন যা বর্তমান সমাজে বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণময় বিষয়। এ পদ্ধতির বিশ্লেষণে প্রয়োজন পাকা জহুরি ও বনেদি লেখকের। এ নিয়ে কিছু লেখা আসলে দুঃসাহসের নামান্তর। তারপরও কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করব মূলত এ মহান অলীর শুভ দৃষ্টি লাভের প্রত্যয়ে।

(ক) 'ফানায়ে ছালাছা' বা ত্রিবিধ রিপুর বিনাশ :

"ফানা আনিল খাল্ক"– অর্থাৎ সৃষ্টির প্রতি নির্ভর না হওয়া। যিনি সৃষ্টিকর্তা, যিনি মালিক, যিনি রিজিকদাতা, যিনি প্রকৃত মুনিব, সেই মহান আল্লাহ্-র

ওপর পরিপূর্ণ ভরসা করা। আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভরশীলতা অনুগত বান্দার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং এ গুণে বান্দা এমন জায়গায় পৌঁছে যায় যে, সবক্ষেত্রেই মহান রব তার জন্য যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত। মহান রব সেই কথা জানান দিচ্ছেন পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে; যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ

'আল্লাহ্‌র ওপর যেই ভরসা রাখে তার জন্য আল্লাহ্ যথেষ্ট।' (সূরা তালাক : ৩)। এ প্রসঙ্গে দয়াল নবির নুরানি বাণী প্রণিধানযোগ্য :

فَقَدْ روى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوكَ- سنن ابن ماجه - (١٢ / ١٢٤)

হযরত সাহাল বিন সা'দ আস্‌সাদি (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বর্ণনা করেন : এক ব্যক্তি দয়াল নবির সমীপে এসে ব্যক্ত করলেন : আপনি এমন আমলের কথা বলুন যা আমি আমল করার ফলে আল্লাহ্ তায়ালা ও মানুষ আমাকে ভালোবাসবেন। প্রিয়নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তুমি বিমুখ হও (আল্লাহ্‌মুখী হও); এতে করে আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে ভালোবাসবেন। মানুষের নিকট চাওয়া-পাওয়া ত্যাগ করো তাহলে তোমাকে পছন্দ করবে মানুষ। (ইবনে মাজাহ) অন্য বর্ণনায় এসেছে প্রিয়নবি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) ইরশাদ করেন : তোমরা যদি আল্লাহ্ তায়ালার ওপর পরিপূর্ণ ভরসা করো তা-হলে তোমাদেরকে পাখিকুলের ন্যায় রিজিক দান করবেন। সকালে খালি পেটে পাখিরা বের হয়ে সন্ধ্যায় পেটভরতি হয়ে ফিরে আসে। (জামে তিরমিযী)

মোদ্দাকথা, ঈমান ও মারেফাতের অন্যতম বৈশিষ্ট মহান রবের ওপর পরিপূর্ণ নির্ভরতা; আর এটাই সৌভাগ্যের চাবিকাঠি; এর দ্বারা বান্দা আত্মনির্ভরশীল হয়ে সমৃদ্ধ ও কল্যাণময় জীবন গড়ার সুযোগ লাভ করে। বলে রাখা ভালো আল্লাহ্ তায়ালার ওপর নির্ভরতা মানে ব্যাবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, কাজ-কর্ম ছেড়ে হাত-পা গুটিয়ে বসা থাকা নয়; বরং সব বৈধ জাগতিক ও ঐহিক কাজ চালিয়ে যেতে হবে; তবে সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ ভরসা রাখতে হবে সৃষ্টিকর্তার ওপর। তাইতো হযরত আহমদ বিন রিদাইয়া (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) ব্যক্ত করেন সত্যিকার একজন

তরিকতপন্থি মুরিদের জন্য মূল ভিত্তি বা বুনিয়াদ হচ্ছে পার্থিব ত্যাগ; অর্থাৎ মহান রবের ওপর নির্ভরতা, (আল আনওয়াল কুদসিয়্যাহ)।

(খ) "ফানা আনিল হাওয়া" বা অনর্থ অনিষ্ট ও অপকার ত্যাগ করা :

এ পদ্ধতির মর্ম হচ্ছে : যা প্রয়োজন নয়, যা না হলে চলে, এমন কাজ-কর্ম ও কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা। মুমিন বান্দার পরিচয় তুলে ধরে মহান রব যে কয়টা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন, এর মাঝে অন্যতম হচ্ছে : অনর্থ ও অযথা কাজ থেকে বিরত থাকা। যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝٣

"এবং যারা দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকে।" (সূরা মুমিনুন : ৩)।

যাবতীয় অকর্ম ও অযথা কথা পরিহার করার মাঝে নিহিত রয়েছে ইসলামের সৌন্দর্য ও কল্যাণ। এতে করে সময় অপচয় হয় না; বরং ওই সময়টুকু ভালো কাজে লাগার সুবর্ণ সুযোগ হয়ে থাকে; ফলে বান্দা গড়ে তুলতে পারে উন্নত জীবন। এ বিষয়ে দয়াল নবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুনাহগার উম্মতের জন্য কতই চমৎকার করে উল্লেখ করেন :

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ(سنن الترمذي -٨ / ٢٩٤)

"একজন মুসলমানের সৌন্দর্য ও পরাকাষ্ঠা হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় কথা-কাজ পরিহার করার মাঝে।" (জামে তিরমিযি)। এমনি করে আরও ইরশাদ হচ্ছে :

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا اَو ليصمت.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালীন দিবসের ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে কিংবা নিরবতা বজায় রাখে।" (কামেয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম)। কাজেই সকল প্রকার অকর্ম, অনিষ্ট, নষ্টামি, অযথা নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন : কুচিন্তা-কুধারণা, হিংসা-বিদ্বেষ, সন্দেহ-সংশয়, হীনতা-সংকীর্ণতা, কামনা-বাসনা ত্যাগের মাধ্যমে সফলতার ছোঁয়া হাতছানি দেবে।

(গ) "ফানা আনিল এরাদা" অর্থাৎ, আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছাশক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া এবং নিজ ইচ্ছা, আয়ত্ত, কর্তৃত্বকে মহান রবের মর্জির ওপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে নিজের অভিলাষকে ভুলে যাওয়া। ফলশ্রুতিতে, আল্লাহ্ তায়ালার মর্জিই বান্দার একমাত্র চাওয়া-পাওয়া ও কামনা হয়ে থাকে। বিষয়টা নবির বাণীতে চমৎকারভাবে ফুটে ওঠেছে এভাবে :

من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له

মানবজাতির সৌভাগ্যর অন্যতম চাবিকাঠি হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালা তার ব্যাপারে যেটাই ফয়সালা করেন তাতে সে সন্তুষ্ট থাকা, (জামে তিরমিযি)। এমনই করে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا (مسند أحمد-٤ / ٢٠٩)

যে ব্যক্তি প্রভুরূপে আল্লাহ্ তায়ালার ওপর সন্তুষ্ট, দ্বীন হিসেবে ইসলামের ওপর সে ব্যক্তি নবি হিসেবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর পরিতুষ্ট মানের স্বাদ গ্রহণ করে।

উল্লেখিত বিষয়ে চমকপ্রদ একটা কথা উল্লেখ করা যায়। আর তা হলো- জোড়া ইমাম আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস হযরত ইমাম সুফিয়ান (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) একদিন হযরত রাবিয়া বছরির (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) সম্মুখে দোয়া করলেন এভাবে : হে আল্লাহ্, আপনি আমার উপর পরিতৃপ্ত হয়ে যান। তখন রাবিয়া বছরি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বললেন : আপনার কি লজ্জা হয় না যে আপনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করছেন, অথচ আপনি তাঁর ওপর রাজি না। সাথে সাথে হযরত সুফিয়ান ছাওরি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) ব্যক্ত করলেন : আল্লাহ্র নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (ইহয়াউল উলুমিদদ্বীন)

অতএব, উপর্যুক্ত 'ফানায়ে ছালাছা' বা ত্রিবিধ রিপুর বিনাশ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে অভিবাসিত এবং দ্বীনের কর্ণধার ইসলামি মহাপুরুষদের নিকট সুবিদিত। এগুলোর কসরতের মাধ্যমে বান্দা নশ্বর জীবনকে ছাপিয়ে অবিনশ্বর ও চিরন্তন আল্লাহ্র সাথে নিসবত বা সম্পর্ক স্থাপন করার মধ্য দিয়ে স্থায়ী ও অমরত্বে জীবন লাভ করতে পারে। কাজেই 'ফানায়ে ছালাছা'র অনুশীলনে উজ্জীবিত হয়ে মুসলিম জাতি পৃথিবীকে উন্নত-সভ্য একটি সমাজ উপহার দিতে পারে বিশ্বাস করি। আয়াতে তাসাউফের শিক্ষা-দীক্ষা ছাড়া ইনসানে কামিল হিসেবে গড়ে ওঠা আদৌ সম্ভব নয়। আর এটার মাধ্যমেই আল্লাহ্র সাথে বান্দার গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে পরস্পরের মিলন ঘটে। তাই তো ইমাম জুনাইদ বাগদাদি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) ব্যক্ত করেন : ان التصوف صفة المعاملة . আল্লাহ্র সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ার নামই তাসাউফ। (ত্ববাক্বাতুস সুফিয়া)

লেখক :
প্রধান ফকিহ, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

মাকাসিদে শরিয়াহ অনুধাবনে 'গাউছিয়ত নীতি'

✍ ড. মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন আল-আযহারী

'গাউছিয়ত নীতি'র পরিচয় :

'গাউছিয়ত নীতি' বলতে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রদত্ত সপ্তপদ্ধতির 'ফানায়ে ছালাছা' বা 'রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তর'কে বোঝায়। তা হল 'ফানা আনিল খালক' বা কোনো সৃষ্টির নিকট কোন উপকার প্রত্যাশা না করা।

'ফানা আনিল হাওয়া'- অর্থাৎ মানব জীবনে যাহা না হলে চলে, এরূপ অনর্থক কাজ-কর্ম পরিহার করা।

'ফানা আনিল এরাদা'- তথা নিজ ইচ্ছার উপর পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়া। এর অপর নাম তাসলিম বা আত্মসমর্পণ। রিপুর এ ত্রিবিধ বিনাশ সাধন করে সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের প্রতি মনোনিবেশ করে মাকাসিদে শরিয়াহ অনুযায়ী জীবন-যাপন করাই হলে গাউছিয়ত নীতির মূল উদ্দেশ্য; যা দ্বারা দুনিয়া-আখিরাতের সফলতা অর্জনে সহযোগিতা লাভ করা যায়।

'গাউছিয়ত নীতি'র উৎস :

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রদত্ত ও অছিয়ে গাউছুল আজম, খাদেমুল ফোক্‌রা হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) বর্ণিত, 'গাউছিয়ত নীতি'র মূল উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। আল্লাহর বাণী-

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝٤

অর্থাৎ "আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার নিকটই সাহায্য যাচনা করি।" (সুরা ফাতিহা, ৪)

এই আয়াতে সৃষ্টি বিমুখতার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অন্যত্র বলেন,

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۙ﴿۴۰﴾ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ؕ﴿۴۱﴾

অর্থাৎ "এবং ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় প্রতিপালকের সামনে (হিসাব দানে) দাঁড়াবার ভয় করে এবং নফ্সকে কু-প্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে নিশ্চয় জান্নাতই তার ঠিকানা।" (সুরা নাজিয়াত, ৪০ ও ৪১)

হাদিসে জিবরাইল নামে প্রসিদ্ধ হাদিস শরিফে আছে রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইহসান কাকে বলে তার উত্তর দিতে গিয়ে এরশাদ করেন :

قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ-

অর্থাৎ "তিনি বলেন, তুমি এভাবে ইবাদত করবে, যেন তুমি প্রেমাস্পদ আল্লাহকে দেখছো। আর যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও তবে এ বিশ্বাস রাখো যে তিনি তোমাকে দেখছেন।" (বুখারি, ১/৮৭)

অনুরূপভাবে এ 'গাউছিয়ত নীতি'র ইঙ্গিত পাওয়া যায় হযরত গাউছুল আজম আব্দুল কাদের জিলানি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) প্রণীত فتوح الغيب নামক কিতাবে। এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র একটি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

المقالة السادسة والخمسون فى فناء العبد عن الخلق والهوى والنفس والإرادة .

অর্থাৎ বান্দা তিনটি বিষয় থেকে নিজের আত্মাকে মুক্ত রাখবে। একটি হলো- আল্লাহ্ ব্যতীত সকল সৃষ্টি হতে নিজেকে মুক্ত রাখা, দ্বিতীয়টি অবৈধ আকাঙ্খা হতে মুক্ত হওয়া, তৃতীয়টি বৈধ ইচ্ছা শক্তি থেকে মুক্ত থাকা। অর্থাৎ যখন বান্দা এ তিনটি বস্তু হতে মুক্ত হয়ে ফানার মকামে উন্নীত হন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত সকল কিছু অন্তর থেকে বের করে দেন, তখন আল্লাহ্ তাকে নিজের প্রিয় বান্দা হিসেবে কবুল করেন এবং মাখলুকের নিকটও প্রিয় পাত্রে পরিণত করেন। তখন ঐ বান্দার জন্য আল্লাহ্র স্বীয় রহমতের দরজা উন্মুক্ত করে দেন আর কখনও বন্ধ না করার ঘোষণা দিয়ে থাকেন। যখন বান্দা আল্লাহ্র প্রিয় পাত্রে পরিগণিত হন তখন তার প্রত্যেক চলন-বলন আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী হয়ে থাকে এবং আল্লাহ্র হুকুমের বাইরে কোনো কাজই তার থেকে প্রকাশ পায় না। যাকে তরিকতের ভাষায় "ফানা ফিল্লাহ" নামে অভিহিত করা হয়।

হযরত মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, কোনো এক বুজুর্গ ব্যক্তি ভ্রমণে বের হয়ে পাহাড়ের চূড়ায় এক গির্জার সম্মুখে

দাড়িয়ে তাতে অবস্থানরত এক পাদরিকে আহ্বান করলে তিনি দরজা দিয়ে স্বীয় মাথা বের করে আগন্তুক ব্যক্তির পরিচয় জানতে চান, লোকটি উত্তরে বলেন,

رجل من أبناء جنسك الأدميين.

অর্থাৎ আমি আপনার স্বজাতীয় একজন মানুষ। রাহেব পাদরি জানতে চান **فماذا تريد؟** অর্থাৎ তুমি কী চাও? লোকটি বলেন :

كيف الطريق الى الله؟

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাওয়ার রাস্তা কোনটি? পাদরি উত্তরে বলেন :

فى خلاف الهوى

অর্থাৎ কু-প্রবৃত্তির বিরোধিতা করাই আল্লাহ্ পাওয়ার রাস্তা। (আল মাওইজাতুল হাছানাহ, পৃ : ১৩)

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে অন্যান্য ধর্মেও রিপুর ত্রিবিধ বিনাশের ধারণা পাওয়া যায়– যা আত্মার উন্নতির সোপান। এ গুণাবলির কারণে মানুষ আত্মার উন্নয়নে সফলতা লাভ করে মহা পুরুষে পরিণত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। যার কারণে আল্লাহ্ এবং বান্দার প্রিয় পাত্রে পরিণত হন। আল্লাহ্ বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

অর্থাৎ "নিশ্চয় যারা ঈমান আনার পর নেক আমল করেন দয়াময় আল্লাহ্ তাদের ভালোবাসেন।" (সুরা মারইয়াম, ৯৬)

আর আল্লাহ যখন কাউকে ভালবাসেন তখন ফেরেশতা ও মানব-দানব, জিন-পরি, হুর, গেলমান সবাই তাকে ভালবাসতে প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হন।

মাকাসিদে শরিয়াহ এর পরিচয় :

মাকাসিদে শরিয়াহ অনুধাবনে 'গাউছিয়ত নীতি' সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে আমাদের জানা প্রয়োজন মাকাসিদে শরিয়াহ বলতে কী বোঝায়? তাই এ বিষয়ে বিশাদ আলোচনা প্রয়োজন **مقاصد** শব্দটি **مقصد** শব্দের বহুবচন যার আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, গন্তব্য। আর **شريعة** শব্দের অর্থ পন্থা, বিধান, আইন, শরিয়ত প্রভৃতি। সুতরাং **مقاصد شريعة** বলতে ইসলামি শরিয়তের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে বুঝায়– যা জানা থাকলে

প্রতিটি মুসলমান দ্বীন-ধর্ম পালনে উৎসাহ পাবেন এবং অন্য ধর্মের লোকেরা ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে জানতে পারবে।

مقاصد شريعة (মাকাসিদে শরিয়াহ) এর মূল উদ্দেশ্য হলো ৫টি– (১) **حفظ الدين** বা ধর্ম রক্ষা করা। (২) **حفظ النفس** বা জীবন রক্ষা করা। (৩) **حفظ العقل** বা বিবেক-বুদ্ধি রক্ষা করা। (৪) **حفظ النسل** বা বংশধারা রক্ষা করা। (৫) **حفظ المال** বা ধন-সম্পদ রক্ষা করা। জীবন ধারণের জন্য এ পাঁচটি শাখা রক্ষা করা অতীব প্রয়োজন। যা না থাকলে মানুষের জীবন-যাপন করা দুরূহ হয়ে পড়বে। সে সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল :

প্রথমটি : حفظ الدين বা দ্বীন-ধর্মের সংরক্ষণ করা

মাকাসিদে শরিয়াহর অন্যতম স্তম্ভ হলো **حفظ الدين** বা ধর্ম রক্ষা করা; কারণ আল্লাহ্ তায়ালা জীন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্র ইবাদত করার লক্ষ্যে, যেমন আল্লাহ বলেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

অর্থাৎ আমি জীন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য। (সুরা যারিয়াত, ৫৬)

আর আল্লাহ্র নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম। যেমনটি আল্লাহ্ পাক বলেন,

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

অর্থাৎ আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম। (সুরা আলে ইমরান, ১৯)

আর শরিয়তের পরিভাষায় দ্বীন বলতে এমন আকিদা-বিশ্বাস ও আমলের নাম যা মানুষের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবি-রাসুলগণ নিয়ে এসেছেন। যা দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধিত হয়।

দ্বীন ধর্ম রক্ষার জন্য প্রকৃত মুসলমান নিজের সব কিছু বিলীন করে দিতে প্রস্তুত থাকেন। আর এ দ্বীন রক্ষার জন্যই জিহাদ ফরয করা হয়েছে। নামাজ, রোযা, হজ, যাকাত সবই ফরযের অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) দোয়াটি আল্লাহ্র বাণীতে এভাবে বলা হয়েছে :

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُكِیْ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۶۲﴾

অর্থাৎ হে নবি আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার নামাজ, আমার কোরবানি আমার জীবন আমার মরণ সবই বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য। (সুরা আনআম : ১৬২)

আর দ্বীন ধর্ম রক্ষার জন্য প্রতিটি মুসলমানকে দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে হবে। আর এ দৃঢ়তা অর্জিত হবে 'গাউছিয়ত নীতি' তথা 'ফানায়ে ছালাছা'র মাধ্যমে। কারণ মানুষ যখন রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ সাধনে সামর্থ্যবান হবে, তখন দ্বীন রক্ষায় জীবন বিলীন করা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আর দ্বীন রক্ষায় যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন আল্লাহ্‌ তাঁদের প্রশংসা করেছেন এভাবে :

وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ یُّقْتَلُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْیَآءٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿۱۵۴﴾

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র রাহে শাহাদাত বরণ করেছে তোমরা তাদের মৃত বলোনা; বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা অনুধাবন করতে পারো না। (সুরা বাকারা : ১৫৪)

ইবাদত-বন্দেগি দ্বীন-ধর্ম পালন করতে হবে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য। তাই লোক দেখানো ইবাদত বা মাখলুককে সন্তুষ্ট করার জন্য যে ইবাদত করা হয় তা আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণীয় নয়- আল্লাহ্‌ বলেন :

وَ مَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ ۙ

এবং ঐসব লোককে তো এ আদেশই দেওয়া হয়েছে যে তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদতে লিপ্ত হয়। (সুরা বাইয়িনাহ : ৫)

অন্যত্র বলেন :

فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّیْنَ ۙ﴿۴﴾ الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ﴿۵﴾ الَّذِیْنَ هُمْ یُرَآءُوْنَ ۙ﴿۶﴾

অর্থাৎ, সুতরাং ঐ নামাযিদের জন্য অনিষ্ট রয়েছে যারা স্বীয় নামাযের ব্যাপারে অমনোযোগী এবং যারা লোক দেখানো ইবাদত করে। (সুরা মাউন, ৪-৬)

আর নিজের মনগড়া কোনো ইবাদত-বন্দেগিও করা যাবেনা কারণ, আল্লাহ্‌ তায়ালা এরশাদ করেন :

وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ وَ مَنْ فِیْهِنَّ ؕ

অর্থাৎ এবং যদি সত্য (কোরআন) তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হতো তবে অবশ্যই আসমান ও জমিন এবং যা কিছু এর মধ্যে রয়েছে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেতো। (সূরা মুমিনুন : ৭১)

তাই মানুষের জন্য আল্লাহ্ এমন বিধান জারি করেছেন যাতে রয়েছে তাদের কল্যাণ এবং এমন সব বস্তুকে হারাম করেছেন যাতে তাদের ক্ষতি রয়েছে। সুতরাং, আমরা নিশ্চিত হলাম যে, ইসলামী শরিয়তের মূল উদ্দেশ্য হলো جلب المصلحة و درء المفسدة ভালোকে গ্রহণ করা, মন্দকে পরিত্যাগ করা।

حفظ النفس বা জীবন রক্ষা করা :

ইসলামি শরিয়তের আরেক মহান মাকসাদ বা উদ্দেশ্য হল জীবন রক্ষা করা। মানব জীবন আল্লাহ্র এক বিশেষ নেয়ামত যা রক্ষা করা প্রতিটি মানুষের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন,

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ

"তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করো না।" (সুরা বাকারা : ১৯৫)

সে কারণে আত্মহত্যা মহাপাপ বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এবং অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করা মহা অপরাধ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। হত্যাকারীর পরিণাম জাহান্নাম করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন :

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ

অর্থাৎ কেউ কাউকে যদি অন্যায়ভাবে হত্যা করে অথবা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা করে, মনে হয় সে জগতের সকল মানুষকেই হত্যা করল। (সুরা মায়িদাহ : ৩২)

এমনকি নিজের গর্ভজাত সন্তানকেও হত্যা করা যাবে না। আল্লাহ্ বলেন :

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ؕ

অর্থাৎ "অভাবের তাড়নায় তোমরা নিজ সন্তানদের হত্যা করবে না; আমিই তাদের ও তোমাদের সকলের জীবিকার ব্যবস্থা করব।" (সুরা বনি ইসরাঈল : ৩১)

অনুরূপভাবে, জীবন সংহারকারী প্রতিটি বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে; অথবা এমন সকল বস্তুকে হারাম করা হয়েছে যা মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়; যেমন বিষ সেবন করা বা বিষাক্ত বস্তু সেবন করা।

আর জীবন ধ্বংসকারী সকল বিষয় থেকে বাঁচতে হলে 'গাউছিয়ত নীতি' অবলম্বন করতে হবে। 'ফানায়ে ছালাছা'র মাধ্যমে মানব জীবনকে যাবতীয় পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে সাধু পুরুষে পরিণত হতে হবে তবেই জীবন হবে সার্থক ও সফল। নতুবা জীব-জন্তুর মত করে জীবন যাপনের মধ্যে কোনো মাহাত্ম্য নেই।

আর 'ফানায়ে ছালাছা' বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ সাধন বই-পত্র পড়ে অর্জন করা যায় না; বরং নেককার-পরহেযগার বুজুর্গানে দ্বীনের সান্নিধ্যে থেকে এসব সাধনা নীতি পালন করতে হবে। যেমনটি আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সংশ্রব অবলম্বন কর।" (সুরা তাওবা : ১১৯)

অলিদের সান্নিধ্যে থাকার কারণে আসহাবে কাহাফের কুকুরের নাজাসাত দূর হয়ে বেহেশতি হওয়ার যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে। যদি একটি কুকুরের এ মর্যাদা লাভ হয় তাহলে আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ কেন সোহবতের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে?

আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে মহান অলিগণের সোহবত এখতিয়ার করার সুযোগ দিন।

حفظ العقل বা আকল-বুদ্ধি রক্ষা করা :

ইসলামি শরিয়তের আরেক মহান উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্র দেওয়া নেয়ামত আকল-বুদ্ধি সংরক্ষণ করা; কারণ আকল পরিপক্ব না হলে মানুষ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। আবার আকল ভ্রষ্ট হওয়া দুনিয়া-আখিরাতের ধ্বংসের আলামত। আল্লাহ্ তায়ালা জাহান্নামিদের আপসোসের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿١٠﴾

"এবং তারা (কাফিরগণ) বলবে যদি আমরা (রাসুলের কথা) শুনতাম এবং বুঝতাম তা হলে আমরা দোযখবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না।" (সুরা মুলক : ১০)

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনুল কারিমের ৪৯ স্থানে আকল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ থেকে আকল সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। তাই আকলের ক্ষতি সাধন হয় এমন ব্যক্তি ও বস্তু থেকে নিজেকে রক্ষা করা অতীব প্রয়োজন।

ইসলামি শরিয়তে আকল বিনষ্টকারী সকল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন মদ পান, নেশা করা, জুয়া খেলা, যাবতীয় মাদক দ্রব্য সেবন করা বা ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষেধ; কারণ মানব জীবন বাঁচাতে এবং জীবন সাজাতে সুষ্ঠু আকল বুদ্ধির প্রয়োজন। এ জন্য বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান নারী-পুরুষের জন্য শরিয়তের বিধি-বিধান প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ্ ঈমানদার সম্বোধন করে বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

"হে ঈমানদারগণ, মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য নির্ণায়ক অপবিত্র, শয়তানি কাজ। সুতরাং, তোমরা এসব থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" (সুরা মায়িদাহ : ৯০)

আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে আকল দিয়ে সম্মানিত করেছেন। মানুষ এবং অন্যান্য জীব-জন্তুর মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণকারী হলো আকল। এ আকলের কারণেই মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বলা হয়। দুনিয়ায় সকল কিছু মানুষের অনুগত হয়েছে এ আকলের কারণে। মানুষ আকলমন্দ বা বুদ্ধিমান হওয়ার কারণেই তার উপর কুরআন নাযিল করা হয়েছে এবং কুরআন হাদিসের জ্ঞানসহ যাবতীয় কল্যাণমূলক জ্ঞান অর্জন করা ফরয করা হয়েছে। আল-কুরআনের প্রথম বাণীই হল :

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ﴿١﴾

অর্থাৎ "পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আলাক : ১) আর আকলকে শানিত করার জন্য বিদ্যার্জনের কোনো বিকল্প নেই। তাই নবি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থাৎ "ইলম অর্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরয।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, ১/২৬০)

আর প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেন :

مداد العلماء خير من دماء الشهداء

"জ্ঞানির কলমের কালি শহিদের রক্তের চেয়ে উত্তম।" অন্যত্র রয়েছে :

وزن حبر العلماء بدم الشهداء فرجح عليه

অর্থাৎ "জ্ঞানীর কলমের কালি শহিদের রক্তের সাথে ওজন দেওয়া হবে। জ্ঞানীর কলমের কালি প্রাধান্য পাবে। অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে আকলকে মুক্ত করার জন্য জ্ঞান-সাধনার প্রয়োজন পড়ে।

আর আকলের সংরক্ষণ ও জ্ঞান অর্জনের জন্য 'গাউছিয়ত নীতি' অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক; কারণ জ্ঞান সাধনায় উপনীত হতে হলে তালিবে ইলমকে সকল প্রকার বিলাসিতা, আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিতে হবে, তবেই সে স্বীয় গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে। 'ফানায়ে ছালাছা' ব্যতীত আকল সংরক্ষণ ও জ্ঞান সাধনায় সফলতা লাভ করা কখনও সম্ভবপর নহে; কারণ সবদিকে মদ, জুয়া ও হারামের ছড়াছড়ি। তাই এ পথে চলতে হলে মহান মুর্শিদের সংশ্রব ও সহযোগিতা প্রয়োজন। তাই নেক সোহবত ছাড়া 'ফানায়ে ছালাছা'র অর্জন কখনও সম্ভব নয়। কবি বলেন,

ইসলাম সে তো পরশ মানিক কে পেয়েছে তারে খুঁজি
পরশে যাহার সোনা হল যারা তাদেরই মোরা বুঝি।

তাই মহান পথ-প্রদর্শকের সোহবত ছাড়া এ পথে সফলতা অর্জন অসম্ভব।

حفظ النسل বা বংশধারা রক্ষা করা :

মহান শরিয়তের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো- حفظ النسل বা বংশধারা রক্ষা করা। আর তা রক্ষা হয় ভৈধভাবে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে। বিয়ের উপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসুলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

অর্থাৎ তোমাদের যাদের সামর্থ্য রয়েছে তারা যাতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কারণ তা চক্ষু অবনত রাখে, গুপ্তাঙ্গের রক্ষণাবেক্ষণ করে। আর যে বিবাহে সামর্থ রাখে না তার জন্য রোযা পালন করা উচিত। এটা তার ঢাল স্বরূপ। (মুসনাদে আহমদ, ৭/৪৪৬)

বিয়ে হলো বংশ রক্ষা করার উত্তম উপায়। তাই বিয়ে বর্হিভুত জীবনযাপনকে ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম করা হয়েছে; বিশেষ করে অবৈধ পন্থায় ব্যভিচারের মাধ্যমে মেলামেশা হারাম করা হয়েছে; যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿۳۲﴾

অর্থাৎ এবং তোমরা ব্যভিচারের নিকট যেয়ো না, নিশ্চয় সেটা অশ্লীলতা ও অত্যন্ত নিকৃষ্ট। (সুরা বনি ইসরাঈল : ৩২)

অবৈধ ভাবে সন্তান জন্ম দিলে তার বংশ পরিচয় থাকে না, সমাজে তারা ঘৃণিত জীবনযাপন করে। তাই ওলামা-কেরাম বলেন,

كون الزواج سنة الله فى عباده وطريقًا لا متداد النسل البشرى من عهد آدم وحواء الى وقتنا الحاضر.

অর্থাৎ হযরত আদম আলাইহিস সালাম এবং হযরত হাওয়া আলাইহাস সালাম থেকে আমাদের সময় পর্যন্ত মানব বংশধারা বৃদ্ধির একমাত্র আল্লাহ্র স্বীকৃত বিধান হলো বিবাহ করা। তাই ইসলামি শরিয়তে যেনা-ব্যভিচার হারাম করার সাথে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাদের জন্য কঠোর শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন যা ক্ষমার অযোগ্য। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন :

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ

অর্থাৎ "যেনাকারী নারী-পুরুষ উভয়কে একশতবার দোর্রা (চামড়া দিয়ে নির্মিত) মারো।" (সুরা নূর : ২) এবং তাদের শাস্তির ব্যাপারে কোনো প্রকার নম্রতা প্রদর্শন না দেখানোর জন্য বিশেষ ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং হাদিস শরিফে প্রয়োজনবোধে তাদেরকে এক বৎসর দেশান্তর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হত্যার শাস্তি অলি বা অভিভাবক বা ওয়ারিশ চাইলে ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু যিনার শাস্তি কোনোভাবেই ক্ষমার যোগ্য নহে। কারণ হত্যা দ্বারা একটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয় আর যেনার কারণে সমাজ-দেশ ধ্বংস হয়ে যায়।

ইসলামি শরিয়তে শিশু হত্যার ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে :

إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا ﴿٣١﴾

অর্থাৎ "নিশ্চয় তাদের (শিশুদের) হত্যা জঘন্য অপরাধ।" (সুরা বনি ইসরাঈল : ৩১)

আর হাদিস শরিফে যেনার ভয়াবহতার বর্ণনা এসেছে এভাবে :

إِيَّاكُمْ وَالزِّنَا، فَإِنَّ فِيهِ سِتَّ خِصَالٍ ، ثَلَاثٌ فِي الدُّنْيَا، وَثَلَاثٌ فِي الْآخِرَةِ.

অর্থাৎ তোমরা যেনা-ব্যভিচার থেকে সাবধান থাকো কেননা যেনায় রয়েছে ছয়টি ক্ষতিকর দিক তিনটি দুনিয়াতে আর তিনটি আখিরাতে।

فاما التى فى الدنيا فنقصان فى الرزق ويصير محرومًا من الخيرات ويصير بغيضا فى قلوب الناس.

অর্থাৎ দুনিয়ার তিনটি ক্ষতি হলো যিনার কারণে রিজিক সংকীর্ণ হয়ে অভাবে পতিত হয়, যাবতীয় বরকত থেকে মাহরুম হয় এবং মানুষের ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়।

واما التى فى الاخرة فغضب الرب وشدة الحساب والدخول فى النار.

"আর আখিরাতের ক্ষতি হলো- আল্লাহ্‌র রোষানলে পড়া, হিসাব-নিকাশ কঠিন হওয়া ও জাহান্নামে প্রবেশ করা।" (তানবিহুল গাফেলিন : পৃ : ১৬৯)

সুতরাং, যে ব্যক্তি 'গাউছিয়ত নীতি' অবলম্বনে জীবনযাপন করবে, 'ফানায়ে ছালাছা'তে অভ্যস্ত হবে তার বংশধারা রক্ষা করা সহজ হয়ে যাবে এবং যেনা-ব্যভিচারসহ যাবতীয় অবৈধ কাজ থেকে বেঁচে থাকা তার জন্য সহনীয় হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ্‌র দরবারে সর্বদা এ দোয়া করতে হবে :

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

অর্থাৎ আমাদেরকে দুনিয়োতে কল্যাণ দান কর আর আখেরাতেও মঙ্গল দান কর এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান কর। (সুরা বাকারা, ২০১)

দুনিয়ার হাছানা হল সতী-সাধ্বী স্ত্রী আর আখিরাতের হাছানা হলো জান্নাত। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সকলকে দুনিয়া আখিরাতে কল্যাণ দান করুন।

حفظ المال তথা ধন-সম্পদ রক্ষা করা :

ইসলামি শরিয়তের মহা উদ্দেশ্যের একটি হল ধন-সম্পদ রক্ষা করা।

অর্থাৎ বৈধ পন্থায় আয় করা আর সৎ পন্থায় ব্যয় করা; কারণ ধন-সম্পদ আল্লাহ্ তায়ালার নেয়ামত। তিনি বলেন :

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ

অর্থাৎ "ধন-সম্পদ ও আওলাদ-ফরজন্দ দুনিয়াবি সৌন্দর্য্য।" (সুরা কাহাফ, ৪৬)

জীবন বাঁচাতে এবং জীবন সাজাতে সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে; কারণ বৈধ পন্থায় সম্পদ আহরণ করা ইবাদত। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾

অর্থাৎ "যখন জুমার নামাজ সমাপ্ত হয় তখন তোমরা আল্লাহ্র জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ্র ফজল বা রিজিক তালাশ করো আর বেশি বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করো যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা জুমু'আ : ১০)

হযরত রাসুলে আকরম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন :

الكسب الحلال فريضة بعد الفريضة

অর্থাৎ হালাল রিজিক অর্জন করা ফরযের পরেই আরেকটি ফরয।"

আবার সম্পদ অর্জনে দ্বীন-ধর্ম থেকে দূরে সরে যাওয়াও কাম্য নয়। আল্লাহ বলেন :

رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

অর্থাৎ "তারা এমন বান্দা যাদেরকে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, বেচাকেনা আল্লাহ্ স্মরণ থেকে গাফিল করে না।" (সুরা নুর : ৩৭)

সম্পদ ব্যয়ে যেমন অপচয় করা যাবে না তেমনই কৃপণতাও কাম্য নহে। সব ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই উত্তম। আল্লাহ বলেন :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ﴿٢٩﴾

অর্থাৎ "এবং আপন হাত স্বীয় ঘাড়ের সাথে আবদ্ধ রেখো না এবং না সম্পূর্ণভাবে খুলে দাও, যেন তুমি বসে থাকো নিন্দিত ও পরিশ্রান্ত হয়ে।" (সূরা বনি ইসরাঈল : ২৯)

এটা একটা দৃষ্টান্ত, যা দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার বেলায় মধ্যপন্থা অবলম্বনের প্রতি লক্ষ রাখার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আহলে আরবের পরিভাষায় خير الامور اوسطها অর্থাৎ মধ্যপন্থাই উত্তম, আর আল্লাহ্‌ মুসলমানকে মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন :

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ

"অনুরূপভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থি উম্মত করেছি; যাতে তোমরা অন্য লোকের জন্য সাক্ষী হয়ে যাও।" (সূরা বাকারা : ১৪৩)

অন্যদিকে, অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আবার, যারা কৃপণতা পরিহার করেছেন তাদেরকে বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, এভাবে :

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

অর্থাৎ "যাদের অন্তরের কৃপণতা থেকে মুক্ত করা হয়েছে তারাই সফলকাম।" (সূরা হাশর : ৯)

ইমাম আবু হামেদ গাজ্জালি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন :

فالمال مثل كمثل الحية فيها سم وترياق وفواءده ترياقه وغواءله سمومه.

অর্থাৎ সম্পদ হলো সাপের ন্যায়। তথায় বিষ এবং বিষের প্রতিষেধক একসাথে থাকে। সম্পদ দ্বারা উপকার অর্জন করা তিরয়াক বা প্রতিষেধক আর অপচয় করা বিষ স্বরূপ। (ইয়াহইয়ু উলুমুদ্দিন ৩/২০৪)

মোট কথা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ইসলামি শরিয়তের অন্যতম চাহিদা। আর এ সম্পদ রক্ষা করার সামর্থ অর্জিত হবে 'গাউছিয়ত নীতি কে নিজের জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে। মানুষ যখন রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ সাধনে সামর্থ্যবান হন তখন সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার তার জন্য সহজ হয়ে যায়। এবং কৃপণতা ও অপচয় থেকে বেঁচে থাকা তার স্বভাবে পরিণত হয়। কারণ ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র দেওয়া আমানত, এতে খিয়ানত করলে তার হিসাব

দিতে হবে। আর আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করলে আল্লাহ্ আরও নিয়ামত বাড়িয়ে দিবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٣٩﴾

অর্থাৎ যা তোমরা ব্যয় কর পরক্ষণেই তিনি তোমাদের দিবেন, তিনি উত্তম রিজিকদাতা। (সুরা সাবা, ৩৯)

সুতরাং, প্রতিটি মুসলমানের উচিত আয়-ব্যয়ের বিধানগুলো মেনে চলা। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে গাউছিয়ত নীতি অবলম্বনে জীবন-যাপন করার তৌফিক দান করুন। আ-মি-ন, বে-হুরমতে সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়ালিহি ওয়া সাহ্‌বিহি আজমাঈন।

সুপারিশ মালা

১। তাসাউফের উপর প্রণিত দেশি-বিদেশি কিতাবগুলো ছাপানোর ব্যবস্থাকরণ।

২। তাসাউফের কিতাবগুলো দক্ষ/মাহির ওস্তাদের মাধ্যমে দরসের ব্যবস্থাকরণ।

৩। দক্ষ দা'ই ইলাল্লাহ তৈরি করণের ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪। অন লাইন-অফ লাইনে ব্যাপকভাবে তাসাউফের বিষয়গুলো প্রচারের ব্যবস্থাকরণ।

লেখক :
ফকিহ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

ইসলামি ফিক্‌হের আলোকে 'গাউছিয়ত নীতি'

✍ এ. বি. এম. আমিনুর রশীদ

ভূমিকা :

সুফিসাধকদের মতে ইলম ও আমলের সমষ্টির নাম ফিকহ। ইসলামি ফিকহ একই সাথে বস্তুগত কল্যাণের এবং আত্মিক উৎকর্ষের ধারক; কারণ হলো, ইসলামি বিধি-বিধান দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনের জন্যেই এসেছে। এ জন্যেই ইসলামি ফিকহ ও বিধান পৃথিবীর অন্য সকল আইন ও কানুন থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। পৃথিবীর অন্য বিধান কেবল বাহ্যিক অবস্থা ও জাতীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয়। ইসলামি ফিকহের সকল বিধান মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থারও সংরক্ষণ করে। তাই হযরত ইমামে আজম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) [৮০-১৫০হি.] ইসলামি ফিকহর পরিচয়ে বলেন :

اَلْفِقْهُ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَالَهَا وَمَا عَلَيْهَا .

"ফিকহ হলো নফ্‌সের পরিচয় লাভ করা এবং নফ্‌সের কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয় দিকের সম্যক জ্ঞান লাভ করা।" (আয যারকাশি : ২২)

ইসলামি ফিকহের যে সকল বিধান বাহ্যিক আমল তথা শরিয়তের হুকুম-আহকামের ভিত্তিতে রচিত; তা হলো ফিকহুজ জাহির (فِقْهُ الظَّاهِرِ)। এ বিধান মানুষকে তার প্রতিটি কাজে হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েযের সতর্ক করে দেয়। আর যে সকল বিধান মানুষকে সকল ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতি মনোযোগী করে, অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি অর্জনে একাগ্রচিত্ত করে; তা হলো ফিকহুল বাতিন (فِقْهُ الْبَاطِنِ)। এ দু'এর সমন্বয়ে মানুষ পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। হযরত ইমাম মালেক (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) [৯৩–১৭৯হি.] যথার্থ বলেছেন :

"যে ব্যক্তি শুধু ফিকহ (ফিকহুজ্ জাহির) এর জ্ঞান অর্জন করলো কিন্তু তাসাউফ (ফিকহুল বাতিন) অর্জন করলো না, সে ফাসিক। পক্ষান্তরে, যে

ব্যক্তি শুধু ফিকহুল বাতিনের জ্ঞান অর্জন করলো কিন্তু ফিকহুল জাহির শিখলো না, সে ধর্মদ্রোহী। কিন্তু যে এ উভয় বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করলো, সে যথার্থ কাজই করলো।" (কারি : ৩৩)।

হযরত হাসান বসরি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) [৬৪২–৭২৮হি.] বলেন :

اَلْفَقِيْهُ الزَّاهِدُ فِىْ الدُّنْيَا اَلرَّاغِبُ فِىْ اَلْاٰخِرَةِ اَلْبَصِيْرُ بِدِيْنِهِ اَلْمُدَاوِمُ عَلٰى عِبَادَةِ رَبِّهِ

"যে ব্যক্তি পরকালমুখী কিন্তু ইহকাল বিমুখ, স্বীয় দ্বীনের প্রতি প্রত্যয়ী এবং স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদতে সদা নিয়োজিত এমন ব্যক্তিকে ফকিহ বলা হয়।" (রদ্দুল মুখতার : ১২৩)

গাউছুল আজম শাহসুফি মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) [১৮২৬–১৯০৬খ্রি.] ছিলেন ফিকহুজ জাহির ও ফিকহুল বাতিনের জ্ঞানে সমৃদ্ধ একজন যুগশ্রেষ্ঠ ফক্বিহ। যিনি যে কোনো বিষয়ের ভিতর বাহির সবদিকে গভীর দৃষ্টিপাত করতেন। সকল বিষয় ছিলো তাঁর দৃষ্টির সামনে। ফলে বাহ্যিক অবস্থা ও প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা করে তিনি মানবজাতির মুক্তির জন্যে তৈরি করেছেন একটি সুফিপথ। এ পথের নাম মাইজভাণ্ডারী তরিকা। কুরআন-সুন্নাহর নির্যাসলব্ধ মানবিকতার আদর্শকে ধারণ করে শরিয়ত পালন তথা ফিকহুজ জাহির চর্চার পাশাপাশি নৈতিক পরিশুদ্ধি তথা ফিকহুল বাতিনের এক পাঠশালা খুলেছেন তিনি। এর সিলেবাস হিসেবে "উছুলে ছাবয়া" নামক সপ্ত কর্মপদ্ধতির এক অনন্য রূপ অঙ্কন করেন। যার এক থেকে তিন ক্রমিক পর্যন্ত পদ্ধতি হলো "ফানায়ে ছালাছা" (ত্রিবিধ বিনাশ পদ্ধতি)। এ পদ্ধতির অন্য নাম "গাউছিয়ত নীতি"। খোদা পথচারীর জন্যে অপরিহার্য এ 'গাউছিয়ত নীতি'কে আমরা ইসলামি ফিকহে হানাফির আলোকে দৃষ্টিপাত করতে চাই।

'গাউছিয়ত নীতি' কী ?

গাউছিয়ত নীতি হলো, হুযুর গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কর্তৃক প্রদত্ত, অছিয়ে গাউছুল আজম আল্লামা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) [১৮৯৩-১৯৮২খ্রি.] কর্তৃক বর্ণিত, পথ-নির্দেশনা বা কর্মপদ্ধতি। যা লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তরিকতপন্থিগণ কোথায় কীভাবে কেমন আচরণ করা উচিত সে সম্পর্কিত

নির্দেশমতো লিখিত বিবৃতি। মূলত এটি একটি মূলনীতি বা পথনির্দেশক সূত্র। যা গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর তরিকতের অনুসারীগণ তরিকত চর্চার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। কুরআন-সুন্নাহ্‌র নির্যাস এ 'গাউছিয়ত নীতি' হলো কুরআন-সুন্নাহ সিদ্ধ নিয়ামাবলির সমন্বিত রূপ। যা ইহকাল ও পরকালের উন্নয়ন ও কল্যাণে অনুসরণ করা হয়। এ নীতি মাইজভাণ্ডারী তরিকা চর্চার ও গাউসে মাইজভাণ্ডারীর আদর্শ বাস্তবায়নের জন্যে গাউছিয়ত সরকার হতে প্রদত্ত অলঙ্ঘনীয় বিবৃতি।

ফানায়ে ছালাছা (اَلفَنَاء الثَلاَثَة) :

'ফানা' (فَنَاءَ) আরবি শব্দ; অর্থ হলো : ধ্বংস, ক্ষয়, বিনাশ, বিলোপ, লয়, শেষ, নিঃশেষ, মৃত্যু। (ফজলুর রহমান ৭৬৭) আর 'ছালাছা' (ثَلاَثَة) অর্থ : তিন। অতএব, আভিধানিক ভাবে 'ফানায়ে ছালাছা' অর্থ দাঁড়ায় ত্রিবিধ বিলোপ পদ্ধতি। সুফিগণ ফানা (فَنَاء) দ্বারা নিন্দনীয় বিশেষণগুলোর বিলুপ্তি বুঝিয়ে থাকেন। মাইজভাণ্ডারী তরিকায় ফানায়ে ছালাছা হলো : ১. ফানা আনিল খাল্‌ক (فَنَاء عَنِ الخَلقِ), ২. ফানা আনিল হাওয়া (فَنَاء عَنِ الهَوَاء) , ৩. ফানা আনিল এরাদা (فَنَاء عَنِ الارَادَة)। মানুষ এই তিনটি নিন্দনীয় গুণ থেকে ফানা হয়ে গেলে, তাঁর ওপর প্রশংসনীয় গুণাবলি প্রকাশ পাবে; যা হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)'-র সপ্ত পদ্ধতির প্রথম অংশের অন্তর্গত। আল্লাহ্‌ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনে এ তিনটি নিন্দনীয় গুণের বিলোপ একান্ত অপরিহার্য।

গাউছিয়ত নীতি–১ : স্বনির্ভরতা

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)'এর নীতির প্রথমটি হলো– ফানা আনিল খাল্ক (فَنَاء عَنِ الخَلقِ)। এর অর্থ হলো সৃষ্টি থেকে বিলোপ। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে; "কাহারো নিকট কোনোরূপ উপকারের আশা বা কামনা না থাকা; যাহার ফলে মানবমন আত্মনির্ভরশীল হয় এবং নিজশক্তি সামর্থ্যের প্রতি আস্থা জন্মে।" (হোসাইন ৭৩)

আত্মনির্ভরশীল মানে স্বনির্ভরতা। স্বনির্ভরতার অর্থ হলো পরনির্ভরতা ত্যাগ করা। পৃথিবীর সকল মহামানবগণ সময়কে কাজে লাগিয়ে জীবনকে মহামূল্যবান করেছেন। তাঁরা এত বেশি কর্তব্য পরায়ণ ছিলেন যে,

আত্মনির্ভরশীলতা, স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ যেন হারিয়ে না যায়, সর্বদা সেই ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা তাঁদের ভিতরে সজাগ থাকতো। দুর্বল মন-মানসিকতা, অপরের নিকট থেকে কিছু পাওয়ার আশা করা স্বনির্ভরতার বিরাট অন্তরায়। এ মন-মানসিকতা সৃষ্টি হয় আল্লাহ্ তায়ালার ওপর ভরসা'র অভাবে। স্বনির্ভরতা হারিয়ে মানুষ দিন দিন অধঃপতিত হতে থাকে এবং ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। এতে ব্যক্তি নিজে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনই পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতিরও অপূরণীয় ক্ষতি হয়। যা ইসলামি শরিয়ত মতে হারাম। ইসলামি ফিকহের মূলনীতির অন্যতম হলো:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"অনিষ্টতা গ্রহণযোগ্য নয় এবং অনিষ্ট করাও গ্রহণযোগ্য নয়।" (ইহসান ৭১)

মাইজভাণ্ডারী তরিকার 'গাউছিয়ত নীতি' ইসলামি ফিকহের নীতি দর্পনে সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। একজন মানুষ যখন সৃষ্টির কাছে কোনো কিছুর প্রত্যাশা ও কামনা-বাসনা না করে স্রষ্টা প্রদত্ত শক্তি ও সামর্থকে ব্যবহারের মাধ্যমে স্বনির্ভর হয়ে ওঠেন; তখন আত্মশুদ্ধিতে বলীয়ান হয়ে ওঠেন। তাঁর আত্মা নির্মল হয়ে যায়। নিজদোষ ধ্যানে মগ্ন থাকায় পরদোষ তালাশের কোনো সুযোগ থাকে না। এতে হিংসা ও ইর্ষামুক্ত আত্মা শক্তিশালী হয়। পর মুখাপেক্ষিতা বর্জন করে দেহশক্তিকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়। দেহ ও মনের শক্তি যখন এক সাথে যোগ হয়; তখন একজন মানুষ আল্লাহ্র ওপর পূর্ণআস্থা ও ভরসা রেখে দুনিয়াবি কাজে সফলতা পায়। আর খোদার ইবাদত-বন্দেগিতে একাগ্রতায় জীবন কাটাতে সক্ষম হয়। এতে দুনিয়াবি সফলতা যেমন আসে; তেমনই আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদতে মগ্ন হওয়া, নির্জনে নিজের অতীত সময়ের ভালো মন্দ কাজের হিসাব-নিকাশ নিজ বিবেকের আদালতে বিচার করতে পারেন। এতে বিবেক নামক আদালত ভালো ও মন্দের যে রায় দেয়; তা বিশ্লেষণ করার সুযোগ হয়। ভালোর জন্যে আল্লাহ্-রাসূলের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন ও পীর মুর্শিদের আনুগত্যের জন্যে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সাহায্য চাওয়া, খোদার দরবারে দু'হাত তুলে প্রার্থনা করতে পারেন। আর মন্দের জন্যে অনুতাপ ও অনুশোচনা করা যায়। সে নিমিত্তে মাইজভাণ্ডারী তরিকায় এ 'গাউছিয়ত নীতি' নির্দেশিত হয়েছে। ইসলামি ফিকহের অন্যতম গ্রন্থ 'আল-সিয়ারুল কবির'-এ উল্লেখ আছে যে, ধর্মীয় ব্যাপারে শাসকগণ জনগণের কল্যাণে যে সব আদেশ প্রদান করেন; সেগুলো মান্য করা আবশ্যক।

ফিকহের নীতি হলো :

لَا طَاعَــةَ لِـمَخلُوق فِى مَعصِيَة الخَالِقِ .

"সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় কোনো সৃষ্টির আনুগত্য নেই।" (ইহসান ৭১)

মুসলমানের কল্যাণের দিক চিন্তা করে এ 'গাউছিয়ত নীতি' মুসলিম মিল্লাতকে উপহার দিয়েছেন হুযুর গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)। ইসলামি বিধান মতে এ নীতি খুবই গুরুত্বের দাবি রাখে। এটি শুধু মুসলিম মিল্লাত নয়, গোটা মানবজাতির কল্যাণে অবদান রাখতে পারে। যা অনুসরণে কোনো অকল্যাণের সম্ভাবনা নাই। ইসলামি ফিকহের মূলনীতির অন্যতম নীতি এক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক :

اُمُوْرُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى السِّدَادِ حَتَّى يَظْهَـرَ غَيْـرُهُ .

"মুসলমানদের কার্যাবলী কল্যাণের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, অন্য কিছু প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত।" (ইহসান ৪৫)

গাউছিয়তের স্বর্নিভরতার এ নীতি শুধু মসজিদে বসে নামায-কালাম, ইবাদত-বন্দেগি করে একজন মানুষকে মসজিদের চার দেয়ালের ভিতরে যেমন সীমাবদ্ধ রাখে না। আল্লাহ্ তায়ালা প্রদত্ত জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা, মেধা-মনন, শক্তি, হাত, পা, মন ইত্যাদির যথাযথ ব্যবহার করে হালাল উপায়ে আয়-উপার্জন করেন; তখন বান্দার কষ্ট, শ্রম, ত্যাগ-তিতিক্ষা, চিন্তা এক কথায় প্রতিটি কাজ ইহকালীন কল্যাণ ও শান্তি এবং পরকালীন মুক্তির উপায় হয়ে যায়। স্বনির্ভরশীল বান্দা যখন বলেন,

حَسْبِىْ رَبِّـىْ جَلَّ اللهُ

অর্থাৎ- 'আল্লাহ্ তায়ালাই আমার জন্যে যথেষ্ট।' – তরিকতের এ যিকির; তার এ মানসিকতা আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান হয়ে যায়। তেমনই ভাবে সৎ উদ্দেশ্যের কারণে দুনিয়াবি কাজগুলোও পরকালের মুক্তির উপায় হয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটায়। কারণ ফিক্হের নীতিমালায় রয়েছে–

اَلْاُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا

"প্রত্যেক বিষয় মাক্সাদ বা উদ্দেশ্য হিসেবেই নিরূপিত হয়ে থাকে।" (ইবনু নুযাইম ১০২)

মানুষ তাঁর কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভ করতে স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে শ্রম-কষ্ট, ত্যাগ সাধনা নির্ভর করে সৃষ্টি করেছেন। তাই গোটা জীবন

মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হওয়ার বাস্তবসম্মত প্রচেষ্টা নিয়ে কাজ করতে হবে। অন্যের কষ্টে অর্জিত কিছু অহেতুকভাবে ভোগ করা উচিত নয়। কর্মবিমুখ, সুঠামদেহী, সবল, সুস্থ মানুষ পরের হক ভোগ করলে তা মালিকের নিকট ফেরত দিতে হবে। ইসলামি আইনের ভাষা হলো :

اَلْاَمْـرُ بِالتَّـصَرُّفِ فِـىْ مِلْكِ الْغَيْـرِ بَـاطِلٌ

"অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপের নির্দেশ বাতিলযোগ্য। হস্তক্ষেপকারীর ওপর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে।" (ইহসান ৪৫)

শক্তি, বল, সুস্থ-সবল এবং সুঠামদেহী মানুষ দরবারি বেসভূষা নিয়ে আল্লাহ্ তায়ালার নামের বন্দনা গেয়ে, ফকিরি ভেক নিয়ে তরিকতের নাম লাগিয়ে ভিক্ষার ঝুলি কাঁদে নিয়ে দেশ-বিদেশে, পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, বাড়ি-বাড়ি, লোকালয়ের দ্বারে দ্বারে ঘুরে না বেড়ায়; তারা যেন কাজকর্মের মধ্যে সময় অতিবাহিত করে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে সে জন্যে মাইজভাণ্ডারী তরিকা চর্চায় 'ফানা আনিল খাল্ক' (স্বনির্ভরতা) কঠোরভাবে মানতে হয়। শুধু নামায, রোযা, হজ, যাকাত তরিকতের সবক আদায়, ওরশ, ফাতিহায় ব্যস্ত থাকার নাম মাইজভাণ্ডারী নয়। ফিকহ শাস্ত্রের অন্যতম প্রবর্তক ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আহমদ ইবনে হাম্বল আশ-শায়বানি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) [১৬৪–২৪১হি.] এর নিকট ফতোয়া চাওয়া হলো : যে ব্যক্তি ঘরে বা মসজিদে নিষ্কর্ম বসে থাকেন; আর বলেন যে, আমি কোনো কাজ করবো না, এখানেই আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে রিযিক দান করবেন– এ ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার ফতোয়া কী? ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) ফতোয়া দিলেন যে, এ লোক মূর্খ। সে কি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান বাণী শোনেনি? তিনি ইরশাদ করেছেন,

جُعِلَ رِزْقِـىْ تَـحْتَ رُمْحِىْ

"আমার জীবিকা আমার বর্শার ছায়ায় রাখা হয়েছে।" (হক ২১৬)

আলস্য, অন্যায়, দুর্নীতি, অন্যের কাছে ধারনা দেওয়ার প্রবণতার কারণে সত্যিকার স্বনির্ভরতা অর্জনের মন-মানসিকতা ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে পরনির্ভর হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। এতে সৃষ্টির কাছে যেমন গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা হারায়, তেমনি আল্লাহ্ তায়ালার নিকটও বান্দা অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই আশরাফুল মখলুকাত মানুষের

শরাফত রক্ষায় গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) স্বনির্ভরশীল হওয়ার নীতি চালু করেন। স্বনির্ভরশীল হওয়ার বাস্তব সম্মত গাউছিয়ত নীতি জারি করেছেন। মানুষের মনে সত্যিকার স্বনির্ভরতার মন-মানসিকতা তৈরি করার লক্ষ্যে বলেছেন, "নিজের হাতে পাকাইয়া খাও, পরের হাতে পাকানো খাইয়ো না।" (ভূঁইয়া ১৩৭) বিশ্বঅলি গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)'এর "ফানা আনিল খাল্ক" (স্বনির্ভরতা) এই 'গাউছিয়ত নীতি'তে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করলে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত হবে। আর আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে এ নীতি অনুসরণ করলে আন্তর্জাতিকভাবে সারাবিশ্বে আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে পারবে।

গাউছিয়ত নীতি–২ : অনর্থ পরিহার

'গাউছিয়ত নীতি'র দ্বিতীয়টি হলো– 'ফানা আনিল হাওয়া' (فنَاء عن الهواء)। এর অর্থ হলো– কামনা, বাসনা ও অনর্থের বিলোপ। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে :

"যাহা না হইলে চলে, সেইরূপ কাজকর্ম ও কথাবার্তা হইতে বিরত থাকা; যাহার ফলে জীবনযাত্রা সহজ ও ঝামেলা মুক্ত হয়।" (হোসাইন ৭৩)

'গাউছিয়ত নীতি'র "ফানা আনিল হাওয়া" ইসলামি ফিকহ তথা ইসলামি বিধানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রতিধ্বনি। প্রবৃত্তির আনুগত্যমুক্ত এ নীতিটির দু'টি দিক পরিলক্ষিত হয়। একটি হলো অনর্থক কর্ম পরিহার করা; অপরটি হলো অনর্থক কথা পরিহার করা।

মানুষ যত বাক্যালাপ বা কাজ করে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা হয়তো লাভজনক হয়; যার মধ্যে পার্থিব বা পরকালীন উপকার নিহিত আছে, অথবা ক্ষতিকারক, যাতে ইহকাল ও পরকালের ক্ষতি বিদ্যমান রয়েছে। যদি অনর্থক ও অনুপোযোগী কথা কিংবা কর্মে সময় ব্যয় না করে, তাতে একবার "সুবহানাল্লাহ" "আলহামদুলিল্লাহ" কিংবা "আল্লাহু আকবর" বলা হতো তাহলে আমলের পাল্লা অর্ধেক পূর্ণ হয়ে যেত। যদি অন্য কোন লাভজনক কাজ করা হতো, তা হলে গুনাহসমূহের কাফ্ফারা এবং পরকালের মুক্তির ওসিলা কিংবা অন্তত ইহকালের প্রয়োজনের ব্যাপারে চিন্তাহীন থাকার কারণ হতো। এই মূল্যবান জীবনে অনর্থক কাজে বা কথায় ব্যয় করা মানে হলো স্বর্ণ-রুপা ও মণি-মুক্তার পরিবর্তে মাটির ঢেলা

গ্রহণ করা। তাই মানুষের মহামূল্যবান জীবনকে বিরাট লোকসান ও ক্ষতি থেকে রক্ষার্থে ইহকাল ও পরকালের সফলতা দানে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) "ফানা আনিল হাওয়া" (অনর্থ পরিহার) নীতি প্রদান করেছেন। কবির ভাষায় :

ہر دم از گرامی ہست گنج بے بہا دل
می رود گنجے چنیں بے لحظ بیکار آہ آہ

জীবনের প্রতিক্ষণ অমূল্য ধন
অনর্থে হচ্ছে ক্ষয় এ মূল্যবান রতন।
নিমিষেই যাচ্ছে ফুরিয়ে নেই কারো হুঁশ,
অনর্থক কথায় কাজে হায়, শত আপসোস।

এ জন্যেই নিরর্থক কর্ম ও কথাকে এবং অনুপকারী যে কোনো কিছুকে 'গাউছিয়ত নীতি'তে গর্হিত বিষয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইসলামি ফিকহের বিধি দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়।

অনর্থ পরিহার- 'গাউছিয়ত নীতি'তে যা না হলে চলে সেই কথা, কাজ ও ব্যবহার পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। অনর্থক ও অনুপযোগী কথা না বলে কথাকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা করতে হবে। ফিকহে ইসলামির একটি মূলনীতি হলো :

اِعْمَالُ اَلْكَلَامِ اَوْلٰى مِنْ اِهْمَالِهٖ

"কথাকে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে কাজে পরিণত করা উত্তম।" (ইবনু নুজাইম ৩৫১)

অর্থাৎ কোনো কথা বললে তা যাতে অনর্থক না হয়ে যায়, সেই লক্ষ্যে কথাকে প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করতে হবে। যদি প্রকৃত অর্থে ব্যবহার সম্ভব না হয় তাহলে রূপক অর্থে ব্যবহার করে হলেও অনর্থক ও অনুপযোগিতা থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে।

কোনো ব্যক্তির মাইজভাণ্ডারী তরিকায় দাখিল হওয়া সহিহ-শুদ্ধ হওয়ার একটি নিদর্শন হলো অপ্রয়োজনীয় কথা না বলা। পরদোষ পরিহার করে নিজের দোষ স্মরণ করা। যাকে বলা হয়েছে "তেলাওয়াতে অজুদ"। নৈতিক ও মানবিক এ নীতির ব্যাপারে 'মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে'র সাজ্জাদানশিন, পীর কেবলা বাইয়াত প্রদানের পূর্বাপর সময়ে বার বার

সতর্ক করেন এবং মুরিদ ভক্তগণকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করেন। ইসলামি ফিকহের মূলনীতিসমূহের অন্যতম মূলনীতি হলো :

اَعْـذِرَ مَـنْ اُنْــذِرَ

"যাকে সতর্ক করা হয়েছে তার ওযর গ্রহণযোগ্য নয়।" (ইহসান ৪৪)

সুতরাং যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে সে বিষয় সম্পর্কে কেউ যদি জ্ঞাত থাকে; তবে তার ওজর গ্রহণযোগ্য হবে না।

এই মূলনীতির ভিত্তিতে বলা যায় যে, যে কেউ 'গাউছিয়ত নীতি'র পরিপন্থী করবেন; তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। বাগবিতন্ডা ত্যাগ করা মাইজভাণ্ডারী 'গাউছিয়ত নীতি'র 'অনর্থ পরিহার' তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ঝগড়া-বিবাদ মানবজীবনের বহু কিছু বাধাগ্রস্ত করে। তাই তা এড়িয়ে চলা সকলেরই কাম্য। ঝগড়ার কারণ হয় এমন যেকোনো কাজ ইসলামে নিষেধ। এ ব্যাপারে ইসলামি ফিকহের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ *হিদায়ায়* উল্লেখিত একটি মূলনীতির উদ্ধৃত করা যায়। মূলনীতিটি হলো :

... اَلْـجِهَالَـةُ مُـفْـضِيَّـةٌ اِلَى الْـمُنَازِعَـةِ فَيَمْتَنِعُ التَّسْلِيْمُ وَالتَّسَلُّمُ وَكُلُّ جِهَالَـةٍ هَـذِهِ صِفَتُهَا تَمْنَعُ الْجَوَازَ هَذَا هُوَالْاَصْلُ .

"... অজ্ঞতা যেহেতু ঝগড়ার কারণ হয়, তাই হস্তান্তর করা এবং হস্তগত করা বাধাগ্রস্ত হয়। আর এ ধরনের প্রতিটি অজ্ঞতাই বৈধতাকে নিষেধ করে। এটাই মূলনীতি।" (মুরগিনানি ২১)

পরের দোষ অন্বেষণ করা, ত্রুটি-বিচ্যুতি খোঁজা এবং অপমান করা, গোপনীয় দোষের পিছনে পড়ে থাকা, কাউকে বিগত অপরাধের জন্যে লজ্জা দেওয়া, পরশ্রীকাতর হওয়া, আড়িপেতে শ্রবণ করা, গোপনে কারও কথা শ্রবিণ করা, কাউকে হেয় মনে করা, বিদ্রুপ করে কথা বলা, ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রকাশ পায় এমন কথা, গালমন্দ করা, অশ্লীল কথা বলা, পরচর্চা করা, গিবত করা, কাউকে মন্দ নামে ডাকা, আলিম-ওলামা, আল্লাহ্‌র অলিদের শানে বেআদবি, মানুষের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও উপহাস করা ইত্যাদি অনর্থক কথার পর্যায়ভুক্ত। এসব কথায় পার্থিব এবং সামাজিক উপকার নেই; কিন্তু অনুভূতিহীনতা এবং অসৎ চরিত্রের কারণে এর মধ্যে আস্বাদন এবং স্বাদ অনুভব করে। এ অর্থহীন কথাগুলো দ্বারা মানুষের মনে কষ্ট হয় এবং মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। যা ইসলামি ফিকহে হারাম এবং পরিত্যাহ্য। ইসলামি ফিকহের নীতিবাক্য হলো :

اَلـضَّـرَرُ يُـزَالُ

"অনিষ্টকর বিষয়কে দূরীভূত বা প্রতিহত করতে হবে।" (ইহসান ৬০)

উপকারশূন্য কাজ হচ্ছে অনর্থক কাজ– যাতে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ নেই। এমন কাজ 'গাউছিয়ত নীতি'র পরিপন্থি। যেমন অপচয় করা ইসলামি ফিকহ তথা ইসলামি শরিয়তে নিষিদ্ধ করেছে। আর মিতব্যয়ী (ফানা আনিল হাওয়া) হতে বলেছে। মূলত ইসলামি শরিয়ত অপচয় করা অপছন্দ করে। এটির রূপ বিকশিত হয়েছে 'গাউছিয়ত নীতি'তে।

ইসলামি ফিকহ তথা শরিয়ত মূলত পাঁচটি মৌলিক মূলনীতির মাঝে আবর্তিত; যা হচ্ছে ধর্ম-বিশ্বাস, জীবন, সহায়-সম্পত্তি, মান-সম্মান এবং বিবেক-বুদ্ধির হেফাযত ও সংরক্ষণ করা। এসব মূলনীতির উদ্দেশ্য হলো কল্যাণ অর্জন এবং অকল্যাণ অপসারণ। (হাবীবুর রহমান ৩৪)

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) তাঁর অনুসারী ও ভক্তদের সহায়-সম্পত্তির সুরক্ষায় ও যা কিছু ক্ষতিগ্রস্ত করবে তা প্রতিহত করতে 'অনর্থপরিহার নীতি'তে সময়, সহায়-সম্পদ অপচয় করতে নিষেধ করেছেন। তাঁর এ নীতি ইসলামি শরিয়তের পাঁচটি মৌলিক মূলনীতি পালনে সহায়ক।

অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকলে দুনিয়া-আখিরাত সুন্দর হয়। শুধু কথার ফুলঝুরি নয়; অর্থবহ কাজের মূল্যায়ন করা হয়েছে ইসলামি বিধানে। ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি হলো :

اِسْتِحْقَاقُ الأُجْـرَةِ بِـعَـمَلٍ لَا بِمُجَرَّدِ قَـوْلٍ

"শুধু কথার দ্বারা নয়; কাজের মাধ্যমেই পারিশ্রমিকের অধিকার লাভ করা যায়।" (ইহসান ৪২)

'গাউছিয়ত নীতি'র মহৎ শিক্ষা হলো অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার যথা- বিড়ি, সিগারেট, তামাক সেবন, পানসহ সকল অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার; যা না হলেও চলে, এমন অভ্যাসের বিলোপ করে শুধু প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার অভ্যাস গড়ে তোলা। এতে নিজের ভিতর আধ্যাত্মিক শক্তি জাগ্রত হয়, দৈহিকশক্তিও ঠিক থাকে। পান, বিড়ি, সিগারেট নিঃসন্দেহে একটি বদভ্যাস ও বাহুল্য খরচ। বিড়ি সিগারেট যেহেতু ব্যক্তিকে মাতাল করে না, আর তা মাতাল হওয়ার জন্যে খাওয়া হয় না, সেই সাথে এতে এমন কোনো পরিমাণ বস্তুও নেই যে, যা সেবন করলে ব্যক্তি মাতাল হয়ে

পড়বে– তাই দুর্গন্ধ এবং ক্ষতিকারক হবার কারণে ফকিহগণ তা খাওয়া হারাম না বললেও মাকরূহ বলে ফতোয়া দিয়েছেন। এ মাকরূহ কাজটি 'গাউছিয়ত নীতি'র বহির্ভূত হওয়ায় মাইজভাণ্ডারীদের তা ত্যাগ করা চাই। কারণ এতে আর্থিক অপচয়ের পাশাপাশি স্বাস্থ্যগত ক্ষতিও রয়েছে। অধিকন্তু গাউছিয়ত নীতিতে তা নিষেধ হওয়ার কারণে এটি আর্থিকের পাশাপাশি আত্মিক ক্ষতিও বলে বিবেচ্য। তাই ধূমপান থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

সাজসজ্জা মানুষের জন্মগত চাহিদা। ইসলামে তা করা বৈধ ও মার্জিত সাজসজ্জা কাম্য। তবে তার একটা সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করতে হবে। গৌরব ও অহংকার প্রকাশের উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা হারাম। দেহের আকৃতি বিকৃত করে যে কোনো সাজসজ্জা, অলংকারের ব্যবহার করা জায়েয হতে পারে না। ব্যক্তির মর্যাদা, অবস্থান অনুযায়ী সাজসজ্জা, অলংকারের ব্যবহার হতে হবে। তবে গৌরব ও অহংকার প্রকাশের উদ্দেশ্যে অলংকার পরিধান করা, সাজসজ্জা করা হারাম। আর অলংকার ও সাজসজ্জায় অপচয় করাও জায়েয নয়; কারণ এগুলো মানুষের দৈহিক, নৈতিক, আর্থিক ও আত্মিক অবনতি ঘটায়। উগ্র সাজসজ্জার পেছনে সময় নষ্ট করে কর্ম থেকে বিরত থাকে। অনেক টাকা-পয়সা ব্যয় করার কারণে সংসারে অভাব-অনটন সৃষ্টি হয়। আর্থিক দুর্গতিতে পড়ে মানুষ দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। এতে একজন মানুষ হালাল-হারামের বিচার না করে জীবন পথে চলতে বাধ্য হয়। মানুষ তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে। নীতিহারা মানুষগুলো ধর্ম-কর্মের তোয়াক্কা না করে পশুত্বকে বরণ করে। তাই 'গাউছিয়ত নীতি'র মাধ্যমে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) মানুষদেরকে ইসলাম ধর্মের সঠিক নীতির চর্চা করতে শিখিয়েছেন।

ফকিহগণ বলেছেন, মুসলমানের ওপর সর্বপ্রথম ফরয হলো সতর ঢাকা। ভূষণ মানে ফ্যাশন নয়। ফ্যাশন প্রিয়তা 'গাউছিয়ত নীতি'তে নেই। ভূষণ, ফ্যাশন মোহের ফলে আদি অসভ্যতা পছন্দ হয়ে পড়ে। অঙ্গবিকৃতকারী পোশাক-পরিচ্ছদসহ যাবতীয় অনর্থক কথা, কাজ ও আচার-ব্যবহার পরিহার করলে একজন মানুষ খোদা পথচারী 'ছালেক' মতে নিশ্চিত বেহেশতি হয়ে যায়। (হক ২৮৬)

বর্তমানে নতুন ফ্যাশন এবং আধুনিকতা নারী-পুরুষকে উলঙ্গ, অর্ধউলঙ্গ করে ফেলেছে। পুরুষেরা হাফ প্যান্ট, ছেঁড়া প্যান্ট পরে নিজেকে গৌরাবান্বিত মনে করে। অর্ধেক উরু খুলে সবার সম্মুখে চলাফেরা করে, যা জাহিলি যুগের অসভ্যতা। এবং আল্লাহ্ তায়ালার অসন্তুষ্টি এবং ইসলামি

বিধানে কবিরা গুনাহ। মেয়েরাও এমন কাপড় পরিধান করে যে, এতে অনেক অঙ্গ যা ঢেকে রাখা ফরয, তা খুলে থাকে। এবং যেসব অঙ্গ ঢাকা আছে এগুলোও এমনভাবে ঢাকা যে, দূর থেকেই এর অবস্থা বোঝা যায়। তাই এটাও উলঙ্গেরই হুকুম রাখে। কিন্তু কিছু সংখ্যক মানুষ ইসলামি বিধানের বিপরীতে ভূষণের ক্ষেত্রে ফ্যাশনের বন্যায় ভেসে ফরযকেও উপেক্ষা করে চলছে। এসব 'গাউছিয়ত নীতি'র কুরআন মাজিদের উদ্ধৃতির আলোকে 'মর্হান' অহংকারী, 'ফাখুরান' গর্বকারী বলে নির্দেশ করেছে। (হক ২৮৬) এসব ফ্যাশন মার্কা ভূষণ হলো অনর্থের পর্যায়। ফকিহগণ এ সব কাজকে কবিরা গুনাহ ও অনর্থক গুনাহ বলেছেন। দুনিয়ার কোনো প্রয়োজন ও স্বাদ এর ওপর নির্ভর করে না। তাই আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ মেনে লজ্জাস্থান ঢেকে রেখে যে কোনো রকম সংযমশীল পবিত্র পোশাকই ইসলামি বিধানে গ্রহণযোগ্য। এটাই হলো ইসলামের ব্যাপকতম গ্রহণযোগ্য নীতি।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এ ব্যাপারেও মুরিদ-ভক্তগণকে সতর্ক করেছেন। সত্যিকারের মাইজভাণ্ডারীগণ নিজের অনর্থক অভিলাষকে ত্যাগ করে আল্লাহ্-রাসূল ও গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী-র সন্তুষ্টি অর্জন করবেন এটাই কামনা।

গাউছিয়ত নীতি–৩ : সন্তোষ

মাইজভাণ্ডারী তরিকার নীতি-আদর্শের তৃতীয়টি হলো 'সন্তোষ'। 'উছুলে ছাবয়া'তে যার নাম 'ফানা আনিল এরাদা' (فناء عن الارادة)। 'এরাদা'র অর্থ হলো– ইচ্ছা, বাসনা, অভিপ্রায়। আর 'ফানা' মানে বিনাশ সাধন। (ফজলুর রহমান ৬২) সুতরাং, "ফানা আনিল এরাদা" অর্থ মানুষ নিজের ইচ্ছাশক্তিকে বিনাশ করে আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছাশক্তিতে বিদ্যমান থাকা। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে :

"খোদার ইচ্ছাশক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া এবং নিজ ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদার ইচ্ছার নিকট বিলীন করা।" (হোসাইন ৭৩)

আল্লাহ তায়ালা ভালো, তাঁর সব কিছু ভালো ও কল্যাণের। তিনি পরম দয়ালু ও দয়াময়। তিনি বিন্দুমাত্রও নিষ্ঠুর নন। অতএব তিনি যা করেন তাতেই কল্যাণ। বান্দা নিজের কল্যাণের বিষয় যা কিছু চিন্তা করেন, তা তার জন্যে সঠিক না-ও হতে পারে। সংশয়-সন্দিহান বান্দার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক একটি বিষয়। আর আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে যা কিছু হবে তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। বান্দা নিজের সন্দেহযুক্ত বিষয়কে

সন্দেহমুক্ত খোদার ফয়সালার নিকট সোপর্দ করবে। এর ওপর সন্তুষ্ট থাকবে। ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতিসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো :

اَلْيَقِيْنُ لَا يَـزُوْلُ بِالشَّكِّ.

"সন্দেহের দ্বারা নিশ্চিত বিষয় দূর হয় না।" (ইবনু নুযাইম ১৮৩)

ফিকহি ইসলামির এ কায়দাটি 'গাউছিয়ত নীতি'র 'সন্তুষ' নীতি বুঝতে অনেক ভূমিকা রাখতে পারে। আল্লাহ্ তায়ালা বান্দার কল্যাণের জন্যেই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সৃষ্টির লালন-পালনকারী। আল্লাহ্ তায়ালাই সবার পূর্ণতা দানকারী। সকল অমঙ্গল ও অকল্যাণ থেকে রক্ষাকারী এবং সবকিছুর মঙ্গল ও কল্যাণকারী। এতে কোনো সন্দেহ নেই। দৃঢ়বিশ্বাস দ্বারা প্রমাণিত সত্য হলো : আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্টির জন্যে যা করেন; সবই মঙ্গল ও কল্যাণকর। সুতরাং বান্দা নিজের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যে কিছু করলে, তাতে আশানুরূপ ফল না পেলেও বিশ্বাস রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ্ তায়ালা যা চান নিঃসন্দেহে তা-ই সত্য ও বাস্তব। এবং বান্দার চাওয়া-পাওয়ার বিষয়টি কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষেত্রে সন্দেহযুক্ত। তাই সন্দেহের দ্বারা পরিচালিত বান্দার ইচ্ছাশক্তি বিলুপ্ত হবে। আর আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছাই যেহেতু নিশ্চিত বিষয়, তাই তা দূর হবে না। বান্দা নিজের ইচ্ছা শক্তিকে 'ফানা' তথা বিনাশ করে খোদার ইচ্ছাতে 'বাকা' তথা বিদ্যমান থাকবে; এটাই মাইজভাণ্ডারী নীতির "ফানা আনিল এরাদা"। যা 'সন্তোষ' শব্দ দ্বারা বিবৃত হয়েছে। বান্দা নিজের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তারপর তার যাহেরি, বাতেনি, শারীরিক-মানসিক যা কিছু অনুকূলে বা প্রতিকূলে ঘটবে, নিজের সবকিছু আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সোপর্দ করবে, ধৈর্যধারণ করবে, বিপদের সম্মুখীন হয়েও আল্লাহ্ তায়ালার সাথে শিষ্টাচারিতা ও দৃঢ়তার সহিত বিজড়িত থাকবে। আর তার তিক্ত ফয়সালাগুলোকে উদারতা ও সন্তুষ্টির সাথে কুরআন-সুন্নাহর বিধান অনুসারে পালন করবে।

আল্লাহ্ তায়ালার উদ্দেশে 'সবর' করবে। তাঁর নির্দেশগুলো পালন করবে এবং নিষেধ হতে বেঁচে থাকবে। তাঁর ফয়সালা ও হুকুম প্রয়োগ হওয়ার সময়ও শান্ত থাকবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অঙ্গীকারের দিকে মনোযোগী হবে। এভাবে বান্দার নফ্স আল্লাহ্ তায়ালার দিকে গমণ করে। ফলে এতে বান্দা তাসাউফের দৃষ্টিতে তাসলিম ও রযা হাসিল করে। আল্লাহ তায়ালার

ব্যবস্থাপনা ও বিধি-বিধানের ওপর সন্তুষ্ট থাকতে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) 'সন্তোষ' নীতির শিক্ষা প্রদান করেছেন। এতে বান্দার আত্মার উন্নতি সাধিত হয়। আল্লাহ্ তায়ালার সাথে বান্দার প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। শুধু দুনিয়ার ভালোবাসার মনোভাব নয়; পরকালমুখী ইহকালীন জীবন-যাপনের কথা বলে ইসলাম। এ পদ্ধতি গ্রহণ করলে বান্দার প্রতিটি দুনিয়াবি কাজ যেমন সুসম্পন্ন হবে, তেমনি এর বিপরীতে সাওয়াবও পাওয়া যাবে। ফিকহে ইসলামির মৌলিক নীতিমালাসমূহ যার ওপর ভিত্তি করে শরিয়তের বিভিন্ন মাসাইলের উৎপত্তি হয়েছে, তার প্রথমটি হলো :

لَا ثَـوَابَ اِلَّا بِالنِّيَّةِ

"বিশুদ্ধ নিয়ত ছাড়া পরম করুণাময়ের সন্তুষ্টি পাওয়া যায় না।" (ইবনু নুযাইম-৬৩)

'তুষ্টি' গুণ অর্জনের জন্যে দুনিয়ার ভালোবাসা ও ধন-সম্পদের মোহ অন্তর থেকে দূরিভূত করতে হয়। জীবন-জীবিকার ব্যাপারে সদুপায়ে চেষ্টা করতে হবে। হালাল উপায়ে স্বাভাবিক চেষ্টা সাধনার পর যা পাওয়া যাবে তাতেই তুষ্ট থাকতে হয়। এতে ব্যর্থতার কঠিন ছাপ মনের ওপর পড়লেও পরবর্তী সময়ে জীবন সহজ ও শান্তিময় হবে। ফিকহে ইসলামির কায়দা হলো–

اَلْمُشَقَّةُ تَجْلِبُ التَيْسِيْـرَ

"কষ্ট সহজতাকে টেনে আনে।" (ইবনু নুযাইম ২২৬)

আল্লাহ্ তায়ালার বান্দা যখন আল্লাহ তায়ালার ফয়সালার ওপর যে কোনো ধরনের অভিযোগ পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ তায়ালার ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকেন, তখন আল্লাহ্ তায়ালার সাথে বান্দার ভালোবাসা ও সম্পর্ক অর্জিত হয়ে যায়। ফলে দু'জাহানের সফলতা নিশ্চিত হয়ে যায়। হুযুর গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) তাঁর সুফিপথের পথিক মাইজভাণ্ডারীগণকে সেই সম্পর্ক ও ভালোবাসার সন্ধান দিতেই 'গাউছিয়ত নীতি'র প্রচলন করেন। 'গাউছিয়ত নীতি'র উদ্দেশ্যটি ইসলামি ফিকহের উদ্দেশ্যেরই প্রতিধ্বনী। কারণ ফিকহে ইসলামির উদ্দেশ্য হলো :

غَرْضُ عِلْمُ الْفِقْهِ هُوَالْفَوْزُ بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ

"ফিকহ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের কামিয়াবি ও সফলতা অর্জন করা।"

ভালো-মন্দ সর্বাবস্থায় খোদার ওপর সন্তুষ্ট থাকা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ফরয। একজন মুসলিম হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে তা মানতে হবে। তরিকতের অনুসারী হিসেবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার বাস্তবায়ন করতে হবে।

উপসংহার

মাইজভাণ্ডারী তরিকা আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্যলাভের সহজ পথ। মানুষকে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির দিশা দিতে 'গাউছিয়ত নীতি' হলো সহজ ব্যবস্থাপত্র। এ 'গাউছিয়ত নীতি' মেনে চলা সকল মাইজভাণ্ডারীদের জন্যে অপরিহার্য। অছিয়ে গাউছুল আযমের বর্ণনামতে 'গাউছিয়ত নীতি'হীন, বিমুখ ব্যক্তির মাইজভাণ্ডারী তরিকার অনুসারী দাবি করা চলে না'। হুজুর গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)'এর কথা নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করতে হলে অছিয়ে গাউছুল আযমের এ সতর্কবাণী মনে রাখা আবশ্যক। কারণ, ফিকহে ইসলামির নীতি হলো :

عِبَارَةُ الرَّسُوْلِ كَعِبَارَةِ الْـمُرْسَلِ.

"দূতের বর্ণনা দূত প্রেরণকারীর বর্ণনার ন্যায়।" (ইহসান ৬২)

তাই গাউছুল আজম আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)'র কথা, নীতি, আদর্শ ও শরাফতের ধারা জারি রাখতে মাইজভাণ্ডারী তরিকার স্বরূপ উন্মোচক, বাহারুল উলুম শাহসুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ), সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহসুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলি) [জন্ম : ১৯৩৬], নায়েবে সাজ্জাদানশীন, নবিরায়ে অছিয়ে গাউছুল আজম, হযরত শাহসুফি সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলি) [জন্ম : ১৯৭২] গাউছিয়ত নীতি প্রচার প্রসার বাস্তবায়নে নিয়োজিত থেকে শরিয়ত, তরিকত, সুন্নিয়তের যে খিদমত করে যাচ্ছেন, তা মেনে চললে দু'জাহানের সফলতা অর্জিত হবে। আল্লাহ্ তায়ালা সবাইকে বোঝার ও আমল করার তৌফিক দান করুন। আ-মি-ন।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. আয যারকশি, বদরুদ্দিন মুহাম্মদ। *আল বাহারুল মুহিত ফি উসুলিল ফিকহ*। কুয়েত : ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯২। মুদ্রিত।

২. কারি, মোল্লা আলি। *শরহ আইনিল ইলমি ওয়া যায়নিল হিলমি*। কায়রো : মাকতাবাতুস সাকাফাতিদ দ্বীনিয়্যাহ, তাবি। মুদ্রিত।
৩. ইবনে আবেদিন, মুহাম্মদ আমিন। *রদ্দুল মুখতার* (ফতোয়ায়ে শামি, খ.১), দেওবন্দ : মাকতাবায়ে যাকারিয়্যাহ, তাবি। মুদ্রিত।
৪. ফজলুর রহমান, ড. মুহাম্মদ। *আল মু'জমুল ওয়াফি* (আধুনিক আরবি-বাংলা অভিধান)। ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনি, ২০০৯। মুদ্রিত।
৫. হোসাইন, সৈয়দ দেলাওর। *বেলায়তে মোত্লাকা*। চট্টগ্রাম : দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI), ২০২২। মুদ্রিত।
৬. ইবনু নুযাইম, যইনুদ্দিন ইবন ইবরাহিম। *আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর*। ঢাকা : মাকতাবাতুল হিজায, তাবি। মুদ্রিত।
৭. ইহসান, মুফতি সৈয়দ আমিমুল। *আল কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ*। ঢাকা : মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, তাবি। মুদ্রিত।
৮. ভুঁইয়া, ফয়েজ উল্লাহ। *গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত*। চট্টগ্রাম : মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী, ২০১২। মুদ্রিত।
৯. মুরগিনানি, বুরহানুদ্দিন আবুল হাসান আলি ইবন আবি বকর আল ফরগানি। *আল হিদায়া* (খ.২)। দেওবন্দ : বাংলা ইসলামিক একাডেমি, তাবি। মুদ্রিত।
১০. হক, সৈয়দ ইরফানুল, *উছুলে ছাবয়া*। চট্টগ্রাম : দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI), ২০২০। মুদ্রিত।
১১. হাবীবুর রহমান, ড. মোঃ। *মাকাসিদ আশ্-শরিয়াহ*। ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল'রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৮। মুদ্রিত।

লেখক :
প্রধান ফকিহ, চট্টগ্রাম নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম
এমফিল গবেষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
রিসার্চ ফেলো, দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)

বর্তমান নৈতিক অধঃপতন থেকে পরিত্রাণ লাভে 'ফানা আনিল হাওয়া'-র ভূমিকা

✍ ড. মোহাম্মদ মতিউল ইসলাম

ভূমিকা : মহান আল্লাহ যুগে যুগে মানুষের হিদায়তের জন্য নবি রাসুল প্রেরণ করেছেন। এমন কোনো যুগ ছিল না, এমন কোনো কাওম ছিল না যখন কোনো না কোন নবী-রাসুল আসেননি। পবিত্র কুর'আনে এসেছে

وَّ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

অর্থাৎ আর প্রত্যেক কাওম তথা জাতির জন্য একজন হিদায়াত দানকারী বা পথ প্রদর্শক তথা নবি রাসুল ছিলেন।[১] হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) পর্যন্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার, মতান্তরে তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার নবি-রাসুল এ পৃথিবীতে আগমন করেছেন, মানব জাতির হিদায়তের জন্য। হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর প্রায় ছ'শ বছর[২] অতিক্রান্ত হওয়ার পর যখন পৃথিবীতে বিপর্যয় নেমে এসে ঘোর অমানিশা চলছিল, চারদিকে মারামারি, খুনা–খুনি, লুট-তরাজ, বেহায়াপনায় ছেয়ে গিয়েছিল তখন আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিদায়াতের জন্য সর্বোপরি জুলুম-নির্যাতনমুক্ত সুন্দর সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর প্রিয় হাবিবকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। প্রিয় নবি তাঁর কৈশোর জীবন থেকে সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ বিনির্মাণে এবং সবার মধ্যে সত্য, ন্যায় ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'হিলফুল ফুযুল' নামে সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। পরবর্তীকালে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নবুয়তের দায়িত্ব অর্পিত হলে, ইসলাম ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার স্বীকৃতি স্বরূপ বিদায় হজের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে

১. সূরা রাদ : ৭

২. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারি, সহীহ বুখারি (আরবি) খণ্ড-১ম, ১৫ পারা, পৃ. ৫৬২

হযরত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর ঘোষণা দেওয়া হয় পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

অর্থাৎ আজকের দিনে আপনার ধর্মকে পরিপূর্ণতা দান করলাম এবং আপনার উপর আমার নে'মাত পূর্ণ করলাম আর ইসলাম কে ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম।[৩] প্রিয় নবির ওফাতের পর ইসলামের এ মিশনকে খুলাফা–ই–রাশিদা সুন্দরভাবে পরিচালনা করে পৃথিবীর পূর্ব–পশ্চিম, উত্তর–দক্ষিণ তথা সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। এরপর সাহাবি -তাবেয়িসহ অলি–বুযুর্গ, আলিম–ওলামা, পীর–মাশায়িখ নিজ-নিজ অবস্থান থেকে ইসলামের সে বিজয় নিশান পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করে যাচ্ছেন। আর এমনই এক আধ্যাত্মিক দরবার হলো চট্টগ্রামের ফটিকছড়িস্থ 'মাইজভাণ্ডার দরবার'। এ দরবারের মহান আধ্যাত্মিক সাধক হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কর্তৃক প্রবর্তিত, খাদেমুল ফোক্‌রা হযরত শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কর্তৃক বর্ণিত, মানব জাতির কল্যাণ ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের এক মহা নে'মত হলো 'ফানায়ে ছালাছা' তথা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ নামক দর্শন। আর এ 'ফানায়ে ছালাছা'র 'দ্বিতীয় দর্শন' হলো 'ফানা আনিল হাওয়া'। বর্তমান নৈতিক অধঃপতনের যুগে এ 'ফানা আনিল হাওয়া' তথা 'অনর্থক কর্ম পরিহার নীতি' একটি যুযোপযোগী নির্দেশনা। যা পালনে বিপদগামী মুসলিম সমাজ মুক্তির পথ পাবে, ইনশা আল্লাহ !

'ফানা আনিল হাওয়া'র মর্ম কথা :

'ফানা আনিল হওয়া'র মর্ম কথা হলো : মনের কু-প্রবৃত্তি তথা মনের ভ্রান্ত ধারণা, মনের খারাপ আশা–আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজকে বিরত রাখা। সোজা সাপ্টা কথা হলো نفس امّارة (কু-প্রবৃত্তি) কে দমন করা। একজন মানুষের তাকওয়া অর্জনের পথে বড় অন্তরায় হলো نفس امّاره এর প্রভাব। একজন মানুষের মধ্যে কু-প্রবৃত্তির প্রভাব প্রবল হলে সে ভালো কাজ করতে

৩. সূরা মায়িদাহ : ৩

পারে না। তার মন তাকে মন্দ কাজের দিকে সর্বদা ধাবিত করে। অন্যায়, দুর্নীতি, লোভ–লালসা, ব্যভিচার, মিথ্যা কথা, মন্দ ব্যবহার মন্দ চিন্তাও মন্দ কাজ তার নিকট প্রিয় মনে হবে। ফলে সে ইবাদত বন্দেগি, ভালো কাজ ও সদাচরণ থেকে দূরে থাকতে চাইবে। একজন মানুষের সফলতা হলো দুনিয়াতে ইবাদত ও ভালো কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করে পরকালে জান্নাত লাভ করা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্‌র ঘোষণা হলো-

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٤١﴾

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সামনে দণ্ডয়মান হওয়ার ভয় করবে ও কু-প্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকবে, তাঁর স্থান হবে জান্নাত।[৪] পূর্বোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হলো যে ব্যক্তি পরকালে একদিন প্রভুর সামনে বিচারের জন্য দাঁড়াতে হবে এ ভয় মনে রেখে দুনিয়াতে খারাপ কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকবে, মনের কু-প্রবৃত্তি কে দমন করে জীবন-যাপন করবে, সে ব্যক্তিই পরকালে জান্নাত লাভে ধন্য হবেন। এ আয়াতদ্বয় কে আরও বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়টি ফুটে উঠে তা হলো পরকালীন জীবনে সফলতা লাভ করতে গেলে একজন বান্দাকে কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলত হবে; যেমন সত্য বলা, সৎকাজ করা, জগড়া-ফ্যাসাদ পরিহার করা, পরনিন্দা-গিবত ও অপবাদ ত্যাগ করা, অযথা কাজ ও অনর্থক কথা ও অপচয় রোধ করতে হবে এবং দুনিয়ার মোহ ও লোভ–লালসা ত্যাগ করতে হবে। সুফি দর্শনে একে বলা হয় 'ফানা আনিল হাওয়া'। নিম্নে এসব বিষয়ে কিছু আলোচনা উপস্থাপিত হলো–

দুনিয়া লোভ–লালসা ও মোহে পরিপূর্ণ এক ঠিকানা :

আল্লাহ তা'আলার এ প্রসঙ্গে ঘোষণা দেন যে,

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾

অর্থাৎ আমি পৃথিবীতে যা রয়েছে তা আকর্ষণীয় (মোহকারী) বস্তুতে রূপায়িত করেছি। যাতে আমি পরীক্ষা করতে পারি কারা কর্মে উত্তম।[৫] সূরা আলে ইমরানে এসেছে :

৪. সূরা নাযি'আত ঃ ৪০-৪১
৫. সূরা-কাহাফ ঃ ৭

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿۱۴﴾

অর্থাৎ মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে নারী সন্তান ও অঢেল সম্পদের প্রতি আকর্ষণ যেমন স্বর্ণ ও রৌপ্য ইত্যাদির আকর্ষণ।[৬] এতে বোঝা যায় যে, দুনিয়াকে নারী, সন্তান, স্বর্ণ, রৌপ্য, গাড়ি-বাড়ি ইত্যাদি দ্বারা মোহিত ও আর্কষণীয় করা হয়েছে। যারা এ সব ক্ষণস্থায়ী উপভোগ্য বস্তুর মোহে পড়বে, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। পরকালে তারা জাহান্নামের যোগ্য হবে। আর যারা এসব আর্কষণীয় বস্তুর মোহে পড়বে না; বরং এ সবের লোভ–লালসা পরিহার করে নিজেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের মুহাব্বতে ডুবিয়ে রাখবে এবং তাদের নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালনা করবে তারাই পরকালীন সফলতা অর্জন তথা জান্নাত লাভে ধন্য হবেন।

পরকালীন সফলতা লাভের সোপান :

পরকালীন সফলতা লাভ করতে গেলে দুনিয়াতে কিছু স্তর পার হয়ে যেতে হবে। কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। যেমন :

১. رزق حلال ও صدق مقال :

صدق مقال তথা সত্য কথা বলা ও সৎকাজ করা পরকালীন সফলতা লাভের সর্বোত্তম সোপান। মিথ্যা সকল পাপের মূল, মিথ্যা পরিহার করে সৎ জীবন–যাপনে অভ্যস্ত হতে পারলে পরকালীন সফলতা লাভ সহজ হয়ে যায়। মহান আল্লাহ্‌র ঘোষণা হলো :

وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۱۹﴾

আর তোমরা সত্যবাদীদের সাথী হয়ে যাও।[৭]

২. رزق حلال :

হালাল উপার্জন এবং حلال খাদ্য গ্রহণ ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। হারাম রিযিক গ্রহণ করলে ইবাদত কবুল হয় না।

---

৬. সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪
৭. সূরা তাওবা : ১১৯

২. অপচয় না করা :

অপচয় করা, অনর্থক খরচ করা ও অতিরিক্ত ব্যয় করা খাদ্য ঘাটতির অন্যতম কারণ। একজনে অপচয় করলে ও অতিরিক্ত ব্যয় করলে অন্য মানুষের জন্য তা ঘাটতির কারণ হয়। যা জুলুমের পর্যায়ে পড়ে। তাই পবিত্র কুর'আনে এসেছে যে :

ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين

অর্থাৎ অপচয়কারীগণ শয়তানের দোসর। [৮]

৩. পরনিন্দা ও পরশ্রীকাতরতা পরিত্যাগ করা :

পরনিন্দা ও পরশ্রীকাতরতা জঘন্যতম এক বদভ্যাস; যা মানব সমাজকে কলুষিত করে। পরিবার ও সমাজকে বিশৃঙ্খল করে দেয়। এর প্রভাবে কলহ-বিবাদ সমাজে লেগেই থাকে। তাই পবিত্র কুর'আনে পরনিন্দা বা গিবতকে 'মৃত ভাইয়ের মাংস' খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর হাদিস শরিফে বলা হয়েছে :

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ

অর্থাৎ গিবত ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য অপরাধ।[৯]

৪. নগ্নতা পরিহার করা ও শালীনতা অবলম্বন করা :

শালীনতা মানব জাতির ভূষণ। প্রত্যেক সমাজ ও ধর্মে শালীনতাকে সমর্থন করা হয়েছে। শালীন জীবন- যাপনের বিষয়ে প্রত্যেক ধর্মে উৎসাহিত করা হয়েছে। নগ্নতা ও অশালীনতাকে কোনো ধর্মেই সমর্থন দেয়া হয়নি; কিন্তু আজ সারা বিশ্বে নগ্নতায় ছেয়ে গেছে। নগ্নতার ক্ষেত্রে মেয়েরাই এগিয়ে গেছে। আজকাল মুসলিম-অমুসলিম সব ধর্মের মেয়েরা পোশাক-পরিচ্ছেদে অশালীন হয়ে যাচ্ছে। পর্দা প্রথা ও হিজাব পরিধানকে মধ্যযুগীয় বর্বরতা আখ্যা দেয়া হচ্ছে। যারা এ ব্যাপারে কঠোরতা দেখান, তথা ইসলামি অনুশাসন পালনে ভূমিকা রাখছেন তাদের বলা হচ্ছে মৌলবাদী পশ্চাৎপদ। অথচ এ ব্যাপারে পবিত্র কুর'আনে এরশাদ হয়েছে :

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

---

৮. সূরা বনি ইসরাঈল : ২৭

৯. শায়খ অলি উদ্দিন মুহাম্মদ ইবন-ই আল-খাতিব, মিশকাত আল-মাসাবিহ, (ইউপি, ভারত : আশরাফি বুক ডিপু, তাবি), পৃ. ৪১৫

তোমরা জাহেলি যুগের ন্যায় নগ্ন হয়ে তথা বেপর্দা হয়ে চলো না।[১০]

এ ছাড়া দাম্ভিকতা পরিহার করা, দুর্নীতি, স্বজন-প্রীতি বিলাসিতাসহ অন্যান্য ছোটো পাপকার্য পরিহার করে তাকওয়া অর্জন করা অপরিহার্য; কেননা, মুত্তাকিরাই আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা সম্মানি। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের মধ্য থেকে মুত্তাকিরাই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত।[১১]

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে প্রতিভাত হলো যে একজন মানুষ মনের কু-প্রবৃত্তিকে দমন তথা 'ফানা আনিল হাওয়া' অর্জনের মাধ্যমে পার্থিব জীবনে ইবাদত বন্দেগি ও সৎভাবে জীবন-যাপন করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ ও পরকালে জান্নাত লাভে ধন্য হতে পারেন। কাজেই বর্তমান নৈতিক পতন যুগের দুর্বিসহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণে 'ফানা আনিল হাওয়া'র ভূমিকা অনস্বীকার্য।

লেখক :
সহকারী অধ্যাপক
সোবহানিয়া আলিয়া কামিল (এমএ) মাদ্‌রাসা
৩১৫, আসাদগঞ্জ রোড, পাথরঘাটা, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম।

১০. সূরা আহযাব : ৩৩
১১. সূরা হুজরাত ঃ ১৩

নেপথ্য তত্ত্ব : ত্রিবিধ বিনাশ

✍ হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জমান

আল্লাহ্ তাআলার অদ্ভুত সব লীলা চলছে তার সৃষ্টি জুড়ে। তার মধ্যে মানুষ হচ্ছে আরও বিচিত্র এক সংযোজন; বলতে পারি, সে যেন একের ভেতর অনেক। সাড়ে তিন হাত আয়তনের ক্ষুদ্র এক দেহের এ প্রাণীর কী যে অসাধারণ ক্ষমতা! বনের হাতি, সমুদ্রের তিমি থেকে জলে-স্থলে, পাহাড়-পর্বতে, সাগরের গভীরে সকল প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণ এবং ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল পেরিয়ে মহাশূন্যের অভিযাত্রী এই মানুষ। 'বিদ্রোহী'র কবি-মানস বুঝি আগেই তা দেখতে পেয়েছিলো। কতটা দূর দর্শন নিয়ে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন,

"মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি
চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা ছাড়ি
উঠিয়াছি চির-বিস্ময়,
আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর।"

এ স্পর্ধিত উচ্চারণ তাঁর মুখেই মানায়, যাঁর দৃষ্টি চলে যায় অসীম নীলিমা ছাড়িয়ে। যান্ত্রিক উৎকর্ষে ক্ষুদ্রাকার এ মানব সন্তান এগিয়েছে আরও বহুদূর। সেই প্রেরণার উচ্ছ্বাসও বাজে তাঁর কল্পনায়, মুঠোফোনের বিচিত্র ক্ষমতা আমাদের মতো বয়স্কদের যখন বোকা বানিয়ে দেয়, তখনও তাঁর দর্পিত পাণী সে সম্ভাবনার আগাম বার্তা শোনায় সচকিত করতে,

"পাতাল ফেড়ে নামব আমি,
ওঠবো আবার আকাশ ফুঁড়ে
বিশ্ব জগৎ দেখব আমি
আপন হাতের মুঠোয় পুরে।"

মুঠোফোন কি তা-ই করছে না?

কথার চেয়েও ভূমিকার আয়তন বেড়ে গেল। কুরআন-সুন্নাহর যত নীতি-কথা, যত নসিহত, বিশাল সৃষ্টির মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিতে

তাঁর দু'প্রতিনিধি গোষ্ঠির জন্য : জিন ও ইনসান। এ দুটোতে ফের শ্রেষ্ঠত্বের রাজমুকুট শোভা পেয়েছে ইনসান'র শিরোপরি।

অসীম কুদরতের মালিক মহান আল্লাহ্ তাআলার ইরশাদ,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾

অর্থাৎ- "আমি জিন ও ইনসান এ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার বন্দেগি করবে।" (সুরা যারিয়াত : ৫৬)

এ নির্দেশনা দু'টি সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে। জ্বিন ও ইনসান এ নির্দেশ পালনে বাধ্য। এ দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈমানদার নর-নারীই শুধু এ নির্দেশের লক্ষ্য। পৃথিবীতে সম্প্রদায়দ্বয়কে আল্লাহ্ তাআলা আবার জীবনযাত্রার স্বাধীনতাও দিয়েছেন; কারণ, দ্বীনের বিষয়ে জবরদস্তি নেই। সূরা বাকারার ২৫৬তম আয়াতে কথাটি উক্ত আছে। এ ছাড়াও অভিন্ন প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা র ইরশাদ রয়েছে,

وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۟ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّ مَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۪ اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ وَ اِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَ سَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

অর্থাৎ- আপনি বলুন, 'সত্য' তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে, তাই যে চায় বিশ্বাস করুক, যে চায় অস্বীকার করুক। নিঃসন্দেহে আমি অনাচারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি আগুন, যার বেষ্টনী তাদের ঘিরে ধরবে। যদি তারা পানীয় চায়, তবে পুঁজের মতো পানীয় দেওয়া হবে, যা তাদের মুখমণ্ডল ঝলসে দেবে। কতই না মন্দ পানীয় তা, ঠিকানাও যে কতই মন্দ। (সুরা কাহাফ : ২৯)

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ভিত্তিতে পরকালের ঠিকানাও হবে দু'রকম।

আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর ফায়সালা হলো,

فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ ﴿٧﴾

অর্থাৎ, "একদল জান্নাতে ও অপর দল জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে।" (সুরা শূরা : ৭) এটাই হবে সর্বশেষ চূড়ান্ত ফায়সালা।

মানুষ যেমন সুন্দর সৃষ্টি, তেমনি বুদ্ধি, জ্ঞান, বিবেচনায় সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ তাআলা র ইরশাদ,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝

অর্থাৎ- আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম অবয়বে। অতঃপর তাকে নিকৃষ্টতম স্তরে ফিরিয়ে দিয়েছি। (সুরা তীন : ৪-৫)

আবার যাঁরা বিশ্বাস ও কর্মে আহ্কামুল হাকিমিন প্রভুর পক্ষ থেকে মুক্তি আর পুরস্কারপ্রাপ্ত হবেন, তাঁরাই সফলকাম, সম্মানিত।

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। নবি-রাসুলগণ তাদের হিদায়েতে'র জন্য প্রেরিত হন। তাঁরা ইনসানের নিকট আল্লাহ্র প্রতিনিধি, তাঁরই প্রেরিত। মানব জগতে মানব হয়েই নবি-রাসুলগণ আবির্ভূত হন এ ধরাধামে। তাঁদের আনুগত্য ও অনুসরণে যাঁরা হন সোনার মানুষ, তাঁদের সান্নিধ্যেই সাধারণ লোকে খুঁজে পান বট বৃক্ষের ছায়ার মতো শান্ত, স্নিগ্ধ সুখের ঠিকানা। মহা প্রভুর ঘোষণা,

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ ۚ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝

অর্থাৎ, যে বান্দা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের হুকুম মান্য করে, তার নসিব হবে তাঁদের সঙ্গ, যাঁদের ওপর আল্লাহ্ নেয়ামত দিয়েছেন। তাঁরা হলেন নবি, সিদ্দিক, শহিদ ও সালেহ্ তথা পুণ্যবান বান্দাগণ। সাহচর্যের জন্য তাঁরা উত্তম। (সুরা নিসা : ৬৯)

আল্লাহ্ ও রাসুলের আনুগত্যের প্রতিদান, যা বক্ষ্যমান আয়াতটিতে বলা হয়েছে, তা হলো আল্লাহ্র নেয়ামতপ্রাপ্ত প্রিয়জনদের সঙ্গ, সাহচর্য। সহীহ্ বুখারি শরিফে সংকলিত মুতাওয়াতির হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলে কারিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে একবার জিজ্ঞাসা করা হল, সে লোকটির মর্যাদা কেমন হবে? যে কেনো জনগোষ্ঠি বা দলকে ভালোবাসে, তবে আমল-আখলাকের ক্ষেত্রে তাঁদের মর্যাদায় পৌঁছতে পারেনি। তখন প্রিয়নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন,

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ

অর্থাৎ "সেদিন তথা রোজ হাশরে প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁরই সঙ্গে থাকবে যাকে সে (ঈমানের ভিত্তিতে) ভালোবাসে।" হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বললেন, পৃথিবীতে কোনো কিছুতে আমি এতটা পুলকিত হইনি, যতটা এ হাদিসের কারণে হয়েছি। তার কারণ; কারণ আল্লাহ্‌র রাসুলকে যাঁরা ভালবাসে, তাঁরা হাশরেও তাঁর প্রিয়সঙ্গ লাভে ধন্য হতে পারবে।

মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দের যুগপৎ অবস্থান। মানুষের মধ্যে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর; কারণ, মানুষ দেহ সর্বস্ব নয়, মানুষকে মানুষের সমাজে গণ্য করা হয় স্থূল দেহটার জন্য নয়; বরং তা হলো দেহাভ্যন্তরে অদেখা একটি শক্তি। শ্বাস-প্রশ্বাসে তার আনাগোনা হয়। তাকে নফ্‌স, রুহ, কাল্‌ব-একাধিক নামে ডাকা হয়। এর স্বরূপ আমরা জানিনা। পবিত্র কুরআনে নফ্‌সকে একাধিক বিশেষণে উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন : আম্মারা, লাওয়ামা, মুৎমায়িন্না। এগুলো এর একেকটি পর্যায়গত :

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ

অর্থাৎ- নিশ্চসন্দেহে নফ্‌স অপকর্মের প্রতি অতিশয় নির্দেশ দাতা। (সুরা ইউছুফ : ৫৩),

وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝٢

অর্থাৎ, আর আমি শপথ করছি ধিক্কার দাতা নফ্‌সের। (সুরা ক্বিয়ামাহ : ২) 'বিবেকের তাড়না' বলে একটি কথা আমরা শুনে থাকি। হযরত হাসান বসরি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি)'-র তাফসিরে এটি দু'অর্থের অবকাশ রাখে। তিরস্কার, ধিক্কার কিংবা ভর্ৎসনা করা শাব্দিক অর্থ হলেও প্রযোজ্যতার অবকাশ ভালো ও মন্দের উভয় দিকে রয়েছে। মন্দ কাজে ধিক্কার সর্বজনবোধ্য। ভালো কাজের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য হয়। অর্থাৎ ভালো কাজের যদি অধিক সুযোগ থাকতো তো কম কেন হলো? এটা হলো, حسنات الابرار سيئات للمقربين নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের জন্য সাধারণ পুণ্যবানদের নেক কাজ দূষণীয় পর্যায়ের; কারণ তাঁদের স্তর মর্যাদায় এটা অবহেলা। সাধনার পরিভাষায় অবহেলাও পাপ। অতঃপর নফ্‌সের সাধনায় উন্নতি হলে সে মুৎমায়িন্না' স্তরে পৌঁছে। সূরা ফাজরের ২৭তম আয়াতে নফ্‌সের চূড়ান্ত স্তরের কথা বলা হয়েছে। নফ্‌স যখন তার প্রতিকূল অবস্থাকে সাধনার মাধ্যমে উত্তরণ করে, তখনই প্রশান্তি অনুভব করে। এ হালতে যখন তার পার্থিব মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হয়, তখন তাঁর উদ্দেশ্যে পর পারের ডাক আসে এভাবে,

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ﴿٣٠﴾

অর্থাৎ- "ওগো প্রশান্ত আত্মা, তুমি চলে এসো নিজ পালনকর্তার দিকে, এমন হালতে যে, তুমি তাঁর প্রতি রাজি, তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অতঃপর আমার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও, আর প্রবিষ্ট হও আমারই স্বর্গ-কাননে।" (সুরা ফজর : ২৭-৩০)

মানুষ মরার আগে মৃত হতে পারলে মরার পর জীবিত হয়। ক্ষণস্থায়ী জীবনকে জয় করতে পারলেই চিরস্থায়ী অনন্ত জীবন। সবই আমাদের সর্বশক্তিমান প্রভুর কুদরাতে হবে সম্ভব। মৃত্যুর পর আমরা মৃত হয়ে যাই। 'রুহ' দেহ পিঞ্জর হতে বেরিয়ে যাওয়াই মৃত্যু। বোঝা যায়, দেহের সঞ্চারণ, স্পন্দন না থাকাই মৃত্যু। নিশ্বাসের সাথেই রুহ নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। রুহ বিহীন মানুষ কারো কাজে লাগেনা, তাই- কাফন-দাফন। দেহ নশ্বর, কিন্তু রূহ তো অবিনশ্বর। তার লয়-ক্ষয় নেই। কুরআনের বর্ণনা মতে 'রূহ' রব তাআলার হুকুম বিশেষ। মুমিনের আকিদা, মৃত্যু পরবর্তী মানুষকে সওয়াল-জওয়াবের জন্য মুনকার-নাকির নামক ফেরেশতাদ্বয় বসাবেন। ওটাও কি জীবন নয়? প্রশ্নোত্তরে মৃত ব্যক্তি কী করে কথা বলবে? সেখানে রুহ প্রত্যর্পণ করা হয়।

নফ্স হলো ভোগবাদী। তার সকল ইচ্ছাকে পূরণ করা হলে সে ক্রমশ পুষ্ট থেকে পুষ্টতর হয়ে ওঠে; পরিণামে মঙ্গলদায়ক কোনো ইচ্ছাশক্তিকে পরোয়া করে না। তাকে বাগে আনতে ভোগের অশ্বকে রাশ টেনে ধরতে হবে। এ জন্য 'খাই, খাই' স্বভাব দমন করতে হবে। নফ্সের আহারে রুহশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই সংযমের অনুশীলন জরুরি হয়। এ জন্য পরিমিত আহার, রোযা ইত্যাদি আমল বাড়ানো উচিত। আহার, নিদ্রা, সুপ্তি হ্রাস করে নফ্সকে দুর্বল করতে হয়। নফ্সের প্রসঙ্গে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের ইরশাদ,

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ﴿٧﴾ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ﴿٨﴾ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ﴿١٠﴾

অর্থাৎ "নফ্সের শপথ, আর যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তাকে তার অসৎ কাজ ও নেক কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। যে তাকে পরিশুদ্ধ করে সে সফলকাম। আর যে কলুষিত করে সে ব্যর্থ মনোরম।" (সুরা শামস : ৭-১০)

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের উপরস্থিত যা কিছু আছে এর প্রত্যেকটি ধ্বংসশীল, একমাত্র আপনার মহিমময় ও প্রতাপমণ্ডিত প্রভুর (কুদরতের) মহান সত্তা ছাড়া। তিনিই অবশিষ্ট থাকবেন। (সুরা আর রহমান : ২৬-২৭)

'ফানা' শব্দের অর্থ বিনাশ, তার বিপরীতার্থক শব্দ 'বাকা' অর্থাৎ- স্থায়িত্ব, অবিনাশ। বলা যায়, একমাত্র স্রষ্টাই সত্তাগতভাবে স্থায়ী। আর সৃষ্টি জগতের অস্তিত্ব মহান স্রষ্টার ইচ্ছা অনুযায়ী স্থায়ী হবে; তিনি চাইলেই বিনাশ বা ফানা হয়ে যাবে। আর যা কিছু আল্লাহ্র মহান সত্তার সাথে সম্পর্কিত; যে আমল মানুষ নিরেট আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই সম্পাদন করে, সে কাজগুলোও স্থায়ী ও অক্ষয় থাকবে। (কুরতুবি, মাযহারি) একথাই স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ্ তাআলা, যা বাকি রাখতে চান তা নিঃসন্দেহে থাকবে।

বাকা ও ফানা শব্দদ্বয় মূলত বিপরীতার্থক। যা বাকী, তা ফানী নয়, আবার যা ফানী তা বাকী। মানব অস্তিত্বে স্থায়ী অস্তিত্বের পরিপন্থী যা কিছু আছে তা বর্জন বা পরিহার করা গেলে স্থায়িত্ব অর্জন করা যায়; তবে তা সাধনা সাপেক্ষ। অছিয়ে গাউছুল আজম খাদেমুল ফোক্রা হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)' র বর্ণিত, মাইজভাণ্ডারী তরিকার উদ্ভাবিত 'উছুলে ছাবয়া'র সাধন নীতিতে ত্রিবিধ রিপু বিনাশের কথা রয়েছে। বাহ্যত; তা আমজনতার জন্য কঠিন মনে হলেও বর্ণনায় যেটুক খোলাসা করা হয়েছে, সে কর্মপদ্ধতি ইচ্ছাশক্তি সবল হলে তেমন কঠিন নয়। ধার্মিক ব্যক্তিমাত্রেরই তা অনুশীলন নেহায়েত জরুরি। আর তা তিনি হযরত কেবলায়ে আলম (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)' র আধ্যাত্মিক নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছেন নিঃসন্দেহে।

ত্রিবিধ বিনাশ তথা 'ফানায়ে ছালাছা' সাধনার ক্ষেত্রে জরুরী ধাপ। ভেড়ার পালে ভিড়ে বড়ো হওয়া ব্যাঘ্রশাবক স্বজাতি না চিনে বাঘ দেখে ভয়ে পালানোন্মুখ হওয়া পুরোনো কাহিনী আমাদের জানা। নিজকে না জানা তেমনই বড়ো এক সমস্যা। আত্মশক্তিতে আস্থাবান হতে না পারলে তার

জন্য সাধনা নয়। পরমুখাপেক্ষিতার অভিশাপ-দগ্ধ এক বিশাল জনশক্তি ভিক্ষাবৃত্তি সহ কত যে অপরাধে জড়িয়ে গেছে। আত্মনির্ভরতার অভাবই এজন্য বহুলাংশে দায়ী। ফরমানে মুস্তফা অনুযায়ী উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। এক ভিখারিকে তার কম্বল বিক্রি করে খাদ্য আর কুড়াল কিনে দেওয়ার ঘটনাটি আমাদের জানা। 'ফানা আনিল খাল্‌ক' মানুষ মাত্রেরই প্রয়োজন। অধ্যাত্ম-সাধনায় তো অপরিহার্য। এরপর আসে হাওয়া বা প্রবৃত্তি বা নফ্‌সের খায়েশকে বর্জন করার স্তর। যা না হলেই চলে এমন কথা ও পরিহারের স্তর এটি। সাধারণত বৈধ; কিন্তু অপরিহার্য নয়, এক কথায় বাহুল্য বর্জন। বিলাসিতা পরিহার। এ স্বভাব সূফিগণের। অছিয়ে গাউছুল আজমে'র ব্যবহার্য ফতুয়ার হাত কনুই ঢেকেই শেষ ছিল। এটা তাঁর নীতির ব্যাবহারিক দিক। অযথা কথা ও কাজ সময়ের অপচয়ই শুধু নয়; বরং ব্যক্তিত্বও খর্ব করে। ব্যক্তির গাম্ভীর্য হারায়। আল্লাহ্‌র রাসুল অযুতেও পানির অপচয় করতে বারণ করেন।

সাধনার আরেকটি চূড়ান্ত স্তর হলো ইরাদা বা নিজ ইচ্ছাকে প্রভুর ইচ্ছার কাছে ন্যস্ত করার মাধ্যমে বিলীন করা। এখানে বড়ো দৃষ্টান্ত হযরত ইসমাঈল (আলাইহিস্ সালাম)। প্রভুর ইচ্ছায় আত্মদানের অনুশীলন এ চূড়ান্ত পর্যায়ে হতে পারে। তাসলিম হলো সোপর্দ করা এবং রজার অর্থ সন্তোষ। প্রেমের ভুবনে এটি চূড়ান্ত পর্যায়। তাই বলি,

"সাধনের কায়দা চানা চাই
বে-কায়দা করলে সাধন মাওলা রাজি নাই।"

লেখক :

আরবি প্রভাষক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম; খতিব, হযরত খাজা গরীব উল্লাহ শাহ (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম।

তাকওয়া অর্জনের ক্ষেত্রে 'ফানা আনিল হাওয়া'র ভূমিকা

✍ গোলাম মোস্তফা মোহাম্মদ নুরুন্নবী আল্-কাদেরী

তাকওয়া, 'ফানা আনিল হাওয়া' ও তাসাউফ সমার্থক শব্দ। তাকওয়া অর্জনের ক্ষেত্রে 'ফানা আনিল' হাওয়ার অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধিও তাকওয়া অর্জনের জন্য পূর্বশর্ত। তাকওয়া হল ইসলামের মৌলিক পরিভাষা। 'উছুলে ছাবয়া' বা 'আত্মশুদ্ধির সপ্তকর্ম পদ্ধতি'র 'ফানা আনিল হাওয়া' হলো জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে সহজতর অবলম্বন। মনের কালিমা, জটিলতা, লোভ, ক্রোধ প্রভৃতি কু-স্বভাব দূর করে মানবজীবনের যাহিরি ও বাতেনি বিশুদ্ধতা অর্জন করে আল্লাহ্‌র সাথে রুহানি সম্পর্ক স্থাপন করাই তাসাউফের মূল লক্ষ্য। তাসাউফ মানুষকে পাশবিকতা বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হতে সহায়তা করে। তাসাউফ অবলম্বন ছাড়া মুমিনের জিনাত বা সৌন্দর্য ফুটে উঠেনা বিধায় তাসাউফ হলো ইসলামের সৌন্দর্যময় দর্শন।

'ফানা আনিল হাওয়া', এটি 'ফানায়ে ছালাছা' বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশের অন্যতম অংশ, অনর্থক কাজকর্ম ও কথাবার্তা হতে বিরত থাকতে হয়। সেগুলো পরিপূর্ণ বর্জন করা। যার ফলে জীবনযাত্রার পথ সহজ হয়। এতে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষে বেহেশতের ওয়াদা রয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : 'যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং নিজেকে কামনা বাসনা থেকে নিবৃত রেখেছেন, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।' (সুরা নাযিআত, আয়াত- ৪০-৪১) হাদিসে পাকে বর্ণিত হয়েছে : "আমার উম্মতের জন্য আমি সর্বাধিক ভয়ের কারণ মনে করি কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ আর দীর্ঘ লালসা ও আকাঙ্ক্ষা। নিশ্চয়ই কু-প্রবৃত্তি সঠিক পথ থেকে বিরত রাখে আর অনাবিল আকাঙ্ক্ষা পরকালকে ভুলিয়ে দেয়।" (বাইহাকি সুয়াবিল ঈমান মিশকাত কিতাবুল আদাহ, হাদিস ৫২১৪। সুফিদের পরিভাষায় 'ফানা আনিল হাওয়া' হল এ বাহুল্য সংসার জীবন পরিহার করে পরকালীন বেহেশতি জীবন নিশ্চিত করা)।

'ফানা আনিল হাওয়া' ছাড়া তাকওয়া অর্জন সম্ভব নয়; কারণ তাকওয়া হলো আল্লাহ তায়ালার ভয়ে নিষিদ্ধ বস্তু সমূহ থেকে দূরে থেকে ইসলাম নির্ধারিত পথে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করা, অথবা যে কাজের কারণে মানুষকে আল্লাহ্‌র কঠিন শাস্তি সমূহের সম্মুখীন হতে হবে এমন কাজকর্ম থেকে নিজেকে রক্ষা করাই হচ্ছে তাকওয়া। আর যিনি তাকওয়া অবলম্বন করেন, তাঁকে বলা হয় মুত্তাকি। মুত্তাকির পারিভাষিক সংজ্ঞায় আল্লামা কাজি নাছির উদ্দিন বেয়যবি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন "শরিয়তের পরিভাষায় মুত্তাকি বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যিনি নিজেকে সবকিছু থেকে রক্ষা করেন, যা তাকে পরকালে ক্ষতির সম্মুখীন করবে।" (তাফসির বায়যাবি ১ম খণ্ড : পৃষ্ঠা ১৬)

আল্লামা জারুল্লাহ মামাখসারি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, "ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় মুত্তাকি বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি নিজ স্বত্তাকে রক্ষা করবেন এমন বিষয় থেকে যার জন্য শাস্তির উপযোগী হয়ে যাবেন, সেটি করণীয় থেকে হোক বা বর্জনীয় হোক।" (তাফসিরে কাসসাফ ১ম খন্ড : পৃষ্ঠা ৩৭)

মহাগ্রন্থ কুরআনে পাকের ১৫ জায়গায় 'তাকওয়া' শব্দটি উল্লেখ রয়েছে। 'আল্ মুত্তাকুন' শব্দের উল্লেখ রয়েছে মোট ৬ জায়গায় এবং 'আল মুত্তাকিন' শব্দের উল্লেখ রয়েছে মোট ৪৩টি জায়গায়।" (আল মু'জাম আল মুফাহ রিস লিআলফাজিল কুরআন আল কারিম : পৃষ্ঠা ৮৪৫-৪৬) পবিত্র কুরআনে বর্ণিত করণীয় বা বর্জনীয় প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ের বর্ণনার সাথে 'তাকওয়া' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। তাকওয়া মানব চরিত্রের অন্যতম সম্পদ। ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনের মূলভিত্তি হলো তাকওয়া, ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠ ও সুন্দর জীবন যাপনের চালিকা শক্তি হলো তাকওয়া, মানব জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সর্ম্পকে মহান আল্লাহ বলেন : "হে ঈমানদাররা, তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো।" (সুরা আলে ইমরান : ১০২)

আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেন, "তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর মনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিদের সাথে আছে।" (সূরা বাকারাহ : ১৯৪)

হযরত রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দুটি চোখে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না। একটি চোখ যা আল্লাহ্‌র ভয়ে

ক্রন্দন করে আর অপর চোখ যা আল্লাহর রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় রাত্রিযাপন করে।" (তিরমিযি)

তাকওয়া শুধু মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয় না; বরং তা জান্নাতে প্রবেশ করতেও সাহায্য করে। তাকওয়া অর্জনের জন্য 'ফানা আনিল হাওয়া' অন্যতম শর্ত। মানুষ যখন যাবতীয় লোভ লালসা পরিহার করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে কু-প্রবৃত্তির বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে, তখনই 'ফানা আনিল হাওয়া'র মাধ্যমে তাকওয়া অর্জিত হয়। আল্লাহ্‌র পথ অবলম্বনের নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, "এটা হচ্ছে দাস মুক্তকরণ অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান। নিকটাত্মীয়, ইয়াতিমকে অথবা ধূলিধূসরিত মিসকিনকে।" (সুরা বালাদ : ১৩-১৬)

হযরত নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো দাসকে মুক্ত করবে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করবেন।" (কুরতুবি, কবির বর্ণিত আছে, "একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) জনৈক মিসকিনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে মাটির উপর খোলা আকাশের নিচে শুয়ে আছে, তখন তিনি মন্তব্য করলেন, এ ব্যক্তি হলো সে ব্যক্তি, যার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন।")

'ফানা আনিল হাওয়া'র মাধ্যমে তাকওয়া অর্জনের জন্য উপরি-উক্ত গুণাবলী বিদ্যমান থাকার সঙ্গে সঙ্গে তার ঈমানদার হওয়া একান্ত জরুরি। কেননা ঈমান ব্যতীত কোনো আমল নেক বলে গণ্য হতে পারে না। কুরআন ও হাদিসের অনেক জায়গায় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "কেবল সে আমলই গণনার যোগ্য ও মুক্তির উপায় যা ঈমান সহকারে করা হবে।" "তাফসিরে বলা হয়েছে 'আর যে লোক নেক আমল করবে সে পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোক, আর হবে সে মুমিন, তবে আমি তাকে পবিত্র জীবন-যাপন করাবো এবং এ ধরণের লোকদের আমল অনুযায়ী এর অতি উত্তম প্রতিদান দেবো।' আরও বলা হয়েছে, 'এধরনের লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেখানে তাদের অগণিত রিজিক দেওয়া হবে।' মোট কথা ঈমান ছাড়া কখনও নেক আমল আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলেন, 'একবার হযরত ওউবাই ইবনে কাব (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কে বলেছেন, 'আপনি তাকওয়া সম্পর্কে আমাকে বলুন। উত্তরে তিনি বললেন, আপনি

কি কখনো কণ্টকাকীর্ণ পথে চলেছেন? হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বললেন, হ্যাঁ। হযরত কাব (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বললেন, কীভাবে চলেছেন? হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বললেন, কাপড়চোপড় গুটিয়ে অত্যন্ত সাবধানে চলেছি। হযরত কাব (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বললেন, এটাই তাকওয়া'। (তাফসির খাযিন : পৃ. ২৮, মায়ালিমুত তানজিল : পৃ.- ৩৫)

বস্তুত; বিবেকের সার্বক্ষণিক সচেতনতা ও সতর্কতা, চেতনা ও অনুভূতির স্বচ্ছতা, নিরবচ্ছিন্ন সাবধানতা, জীবন পথের কণ্টক সমূহ থেকে আত্মরক্ষার প্রবণতা, অব্যাহত ভীতি প্রবৃত্তির নাম তাকওয়া। বাস্তবিক পক্ষে এধরনের গর্বিত অর্জন 'ফানা আনিল হওয়া'র মাধ্যমে অর্জিত হয়। জীবন পথের কণ্টক সমূহ হচ্ছে প্রবৃত্তির কুৎসিত কামনা, বাসনা ও প্ররোচনা, লোভ-লালসা, মোহ , ভয়-ভীতি ও শঙ্কা, আশা পূরণে সক্ষম নয় এমন কিছু কারও কাছে আকাঙ্ক্ষা করা, ক্ষতি বা উপকার সাধনে সক্ষম নয় এমন কারও মিথ্যে ভয়ে আক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি। (তাফসির ফি যিলালিল কুরআন খণ্ড ১ম : পৃষ্ঠা ৬১)

তাকওয়া বা আন্তরিকতাবিহীন কোনো কাজই সফলতা বয়ে আনে না। যেকোনো কাজের প্রাণ হলো তাকওয়া বা 'ফানা আনিল হাওয়া'। বিশেষ করে এবাদত সম্পর্কে যা কিছু করা হয় তা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হওয়ার জন্য তাকওয়া একমাত্র প্রয়োজন; কারণ আল্লাহ কেবল মুত্তাকিদের কুরবানি গ্রহণ করে থাকেন। (সুরা মায়িদাহ : ২৭)

যাঁরা তাকওয়ার গুণ অর্জন করতে পারেন তাঁরা আল্লাহ্‌র ভালোবাসা লাভে ধন্য হন, আল্লাহ্ তাঁদের অভিভাবক হয়ে যান এবং তাঁদের জীবন-জীবিকা অত্যন্ত সহজ সাবলীল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় অবস্থায় অতিবাহিত হয় বলে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম ফখরুদ্দিন আল-রাযি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেছেন, মুত্তাকির মর্যাদা বর্ণনায় পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'হুদাল লিল মুত্তাকীন' আয়াতাংশটি ছাড়া যদি আর একটি আয়াতও না থাকত তবে তাদের মর্যাদা বর্ণনায় এটিই যথেষ্ট ছিল। যে মানুষ যত বেশি তাকওয়ার অধিকারী হবে সে জাগতিক জীবনে সমাজে তত বেশি মর্যাদা ও সম্মানের যোগ্য হবে এবং পরকালে আল্লাহ্‌র কাছে বেশি সম্মানিত হবে। তাকওয়ার জীবন পরিশুদ্ধ জীবন ও সফলতার জীবন। তাকওয়ার গুণ অর্জন ছাড়া দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার কোনো বিকল্প নেই। তাকওয়ার পোশাকে যারা আচ্ছাদিত তাদের থেকে কোনো রকম অন্যায় ও অসৎ কর্ম

হতে পারে না। অশ্লীলতা, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, সুদ, ঘুস, সম্পদ লুটপাট, কাউকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব রূপে নির্ধারিত হাক্কুল্লাহ্ ও হাক্কুল ইবাদ পালনে উদাসীন থাকা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থেকে মুত্তাকি জীবন যাপন করে। সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার পাশাপাশি দেশ ও জাতির উন্নয়নে গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে অবদান রাখতে সচেষ্ট থাকে।

'ফানা আনিল হাওয়া' বা তাকওয়াবিহীন কোনো কাজই জীবনে সফলতা আনে না। যে কোনো কাজের প্রাণ হলো তাকওয়া। বিশেষ করে ইবাদত হিসেবে যা কিছু করা হয় তা আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় হওয়ার জন্য তাকওয়া খুবই প্রয়োজন। তাকওয়ার মৌলিক স্থান হলো মানব দেহের কল্ব। কল্ব এর গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, দেহের মধ্যে এমন একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, তা যখন সুস্থ ও রোগমুক্ত যাকে তখন সমুদয় দেহই সুস্থ ও রোগমুক্ত থাকে। আর তা যখন রোগাক্রান্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে তখন সমুদয় দেহটি রোগাক্রান্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। তোমরা জেনে রেখো তা-ই হলো কল্ব (আত্মা)। (সহিহ্ আল্ বুখারি : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩)

তাকওয়ার মৌলিকত্বে বাহ্যিকতার তুলনায় ভিতরটার সম্পৃক্ততা বেশি। গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে মহান আল্লাহকে ভয় করার মানসিকতা গড়ে তোলা এবং জীবনের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনায় এই চিন্তার লালন করা যে, মানুষের যে কোনো কর্মকাণ্ড তথা ভালো-মন্দ, ন্যায় অন্যায়, পাপ-পুণ্য সবকিছু লিপিবদ্ধ করার জন্য ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছে। ছোটো-বড়ো কোনো কিছুই তার খতিয়ানে লেখা থেকে বাদ যাচ্ছে না। এক সময় সে তার কৃত সমুদয় কর্মকাণ্ড স্বচক্ষে দেখতে পাবে। এই অনুভূতি নিয়ে জীবন পরিচালনা করাই হলো 'ফানা আনিল হাওয়া'র মাধ্যমে তাকওয়ার দাবি। তাকওয়া বাহ্যিক আড়ম্বর ও লৌকিকতার কোনো স্থান নেই। "মানুষের বাহ্যিক অবস্থা এবং সম্পদের প্রতি আল্লাহ দেখেন না বরং তিনি দেখেন মানুষের কর্মকাণ্ড এবং মন-মানসিকতা।" (সহিহ্ মুসলিম, খন্ড : ৭, পৃ. ৩৫৪)

মানব দেহের কোন স্থানে তাকওয়ার অবস্থান সে সম্পর্কে প্রিয় হযরত নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো, 'তাকওয়া' এখানে এ বাক্যটি তিনি তিন বার বলে তাঁর বক্ষদেশের দিকে ইশারা করেছেন।'

অর্থাৎ ,'আত্ তাকওয়া' বাক্যটি তিন বার বলেছেন। (মিশকাতুল মাসাবিহ কিতাবুল আদাব, পৃ ৪২২ : হাদিস নং-৪৯৫৩)

তাকওয়ার ধারক ও বাহক এ ধরনের সম্মানিত ব্যক্তিরাই লাভ করবেন জান্নাতের সুমহান মর্যাদা। যেখানে থাকবে প্রস্রবণ ঝরনাধারা।

তাকওয়া শুধু আল্লাহ্ ভীতির মধ্যে সীমিত নয়, বরং সত্য সন্ধান, সত্য গ্রহণ, সত্যের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা, আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করা, আল্লাহ্র সাথে কর্তব্য পালন করাই হলো তাকওয়া; অর্থাৎ মানব জীবনের সকল কর্মকাণ্ড ও তৎপরতাকে আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে পরিচালনা করা, আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী সকল কাজ সম্পাদন করা, আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ পথ ও পন্থা পরিহার করা এবং জীবনের প্রত্যেক পর্যায় ও ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সৃষ্টিকূলের কল্যাণ কামনা করা, ইত্যাদি জবাবদিহিতামূলক কর্ম সচেতনতার সাথে পালন করাই প্রকৃত তাকওয়া। তাই নানা সমস্যায় জর্জরিত মুসলিম জাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ লাভের জন্য প্রয়োজন মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকওয়ার অর্জন এবং তাকওয়ার ভিত্তিতে জীবন গঠন। যখন থেকে মানুষ প্রকৃত তাকওয়াবান হবে তখন থেকে এ বিশৃঙ্খল সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। ফলে সমাজ হবে সুখে শান্তিতে সমৃদ্ধ স্থিতিশীল ও প্রাণবন্ত। এজন্যই তাকওয়া হলো মানব জাতির দুনিয়ার কল্যাণ এবং আখিরাতের মুক্তি ও নাজাতের পূর্বশর্ত। এ শর্তের পরিপূর্ণতায় রয়েছে মানব সৃষ্টির সার্থকতা।

লেখক :

সহকারী অধ্যাপক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া কামিল মাদ্রাসা
খতিব, লালদিঘী সিটি কর্পোরেশন শাহী জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম।

‘ফানা আনিল এরাদা’ তথা ‘ইচ্ছার বিনাশ’ প্রসঙ্গঃ কুপ্রবৃত্তির লয় ও সুপ্রবৃত্তির উদয়

✍ মোহাম্মদ নুরুল আবছার

‘ফানা আনিল এরাদা’র পরিচয় ঃ “ফানা” আরবি শব্দ। ইহার অর্থ- লয়, বিনাশ ও ধ্বংস। আর “এরাদা” শব্দের অর্থ- ইচ্ছা, অভিপ্রায় ও কামনা। সুতরাং ইচ্ছা বা চাহিদার বিনাশ-ই ‘ফানা আনিল এরাদা’।

তরিকতের পরিভাষায়- আল্লাহ্ ছাড়া অবশিষ্ট সব কিছুর অভিপ্রায় ধ্বংস করে দেওয়াকে “ফানা আনিল এরাদা” বলে। যেমন গাউছে পাক (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন : দুনিয়া ও আখিরাতের সকল চাহিদা বর্জন করাকে “ফানা আনিল এরাদা” বলা হয়।[১]

আলোচ্য বিষয়ের উপর আলোচনা করতে গিয়ে সর্ব বিষয়ের পণ্ডিত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন :

فنا عن الارادۃ یعنی خواہش نفس کے پیش نظر کسی چیز کی آرزو نہیں کرنا-

نہ دنیا کی لذّات وشہوات کی اور نہ ہی جنّت کے ناز ونعمت کی-

অর্থাৎ “ফানা আনিল এরাদত” বলতে কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় দুনিয়া-আখিরাতের স্বাদের লোভ না করা এবং জান্নাতের নেয়ামতরাজির ভোগের ইচ্ছা না করাকে বুঝায়।[২]

ইমাম গাযালি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) তাঁর অমর গ্রন্থ “কি-মিয়ায়ে সা’দাত্”-এ লিখেছেন- সৃষ্টির সব কিছু থেকে ইচ্ছার কামনা ও বাসনা তুলে নিয়ে একমাত্র আল্লাহ্র প্রতি নিবদ্ধ করাই “ফানা আনিল এরাদা”।

---

[১] اِذا فَنَی العبد عَنِ الخلقِ والْهَوی والنّفسِ والاِرَادۃِ والاَمَانِیْ دُنْیًا و اُخری وَلم یُرِدُ اِلَّا اللّٰہَ عزَّوَجَلَّ গ্রন্থ: “ফতহুল গুয়ুব”: পৃ: ৫৭৯: কৃত: আবদুল কাদির জীলানী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি)।

[২] শরহে ফতুহুল গুয়ুব: উর্দু অনুবাদ আল্লামা জহুর আহমদ জালালী, পৃ: ৫৮১।

এ অবস্থায় রোযা, নামায ও ইবাদত হলো- সর্বোত্তম।[৩]

'ফানা আনিল ইরাদা'র উপকারিতা : (১) ইচ্ছার বিনাশ দ্বারা 'বান্দাহ ওয়াসিল বিল্লাহ্' তথা আল্লাহ্র সম্পৃক্ত হয়ে যায়। তখন সৃষ্টিকুল তার বন্ধু হয়ে যায়। তবে তিনি আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভালোবাসেন না, সবাই তাকে ভালোবাসে। পবিত্র কুরআনে সূরা মারইয়ামে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

পবিত্র হাদিসে ইরশাদ হয়েছে :

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ

অর্থাৎ ইচ্ছার বিনাশ যারা ঘটায় তাদেরকে আল্লাহ্ ভালোবাসেন আর সৃষ্টিকুলও তাদের ভালোবাসে।

(২) ইচ্ছার বিনাশ সাধনকারীর জন্যে আল্লাহ্র দয়ার দরজা খুলে দেওয়া : সে দরজা দিয়ে অবারিত দয়া প্রবেশ হতে থাকে। তার জন্যে সে দরজা কখনও বন্ধ করা হয় না। যেমন সায়্যিদুনা গাউছে আ'জম জিলানি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) কে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

قَدْ اَمَنْتُكَ يَا عَبْدُ الْقَادِرِ مِنَ الرَّدِّ

অর্থাৎ 'হে আব্দুল কাদির! আমি তোমাকে আমার প্রত্যাখ্যান, আজাব, গজব ও সাজা থেকে মুক্ত ঘোষণা করছি। অর্থাৎ আমার দয়ার চাদর দিয়ে আবৃত করে রেখেছি। তুমি সব সময় আমার রহমত দ্বারা সিক্ত হতে থাকবে।'[৪]

(৩) ইচ্ছার বিনাশকারী বান্দাহ শুধুই আল্লাহ্র ইচ্ছাই চলবে। তাঁর জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দেবে। আল্লাহ্র ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা হয়ে যায়। যেমন শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন :

وَيَشَاءُ بِمَشْيَتِهِ وَيَرْضَى بِرِضَاءه وَيَتَمَثَّلُ اَمْرَهُ دُوْنَ غَيْرِهِ .[৫]

পবিত্র কুরআনে সুরা আনফালে ইরশাদ হয়েছে :

---

[৩] কিমিয়ায়ে সা'দাত: কৃত: ইমাম গাযালি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি), পৃষ্ঠা, ৫৫৬।

[৪] ফত্হুল গুয়ুব: কৃত আব্দুল কাদির জীলানি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি), পৃ : ৫৮২।

[৫] প্রাগুক্ত।

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

অর্থাৎ 'হে প্রিয় রাসুল! যখন আপনি নিক্ষেপ করেন, তখন আপনি নিক্ষেপ করেননি; বরং সন্দেহাতীত ভাবে আল্লাহই নিক্ষেপ করেন।'

এখানে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রিয় রাসুলের কাজকে নিজের কাজ বলেছেন। কারণ প্রিয় রাসুল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ইচ্ছা বিনাশ করে একমাত্র আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই নিক্ষেপ করেছেন।

আল্লামা জালাল উদ্দিন রুমি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন :

چوں شدی من کان للہ از دلہ + من ترا باشم کہ کان اللہ لہ

অর্থাৎ তুমি যখন নিজের ইচ্ছার বিনাশ ঘটিয়ে আল্লাহ্র ইচ্ছায় চলবে, তখন আমি তোমার হয়ে যাবো। তিনি আরও বলেন :

گہ توئی گویم ترا گاہے منم + ہرچہ گویم اِفتاب روشنم

অর্থাৎ বান্দাহ্ তার কাজ নিজে করলেও, নিজের কথা নিজে বললেও প্রকৃত অর্থে আল্লাহই তার কর্তা ও কথক।

(৪) ইচ্ছার বিনাশকারী বান্দাহ্ তার সকল কাজে ও ইচ্ছায় শুধুই আল্লাহকে দেখতে পায়। তার চারদিকে যা আছে তার সবটাতে আল্লাহ্র অস্তিত্বই অনুভব করে। এ সম্বন্ধে গাউছে পাক (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন :

وَلَا يَرَى مَا حَوْلَهُ لِغَيْرِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وُجُوْدًا وَ فِعْلًا وَقَوْلًا .

তখন সে বান্দাহ'র সাথে আল্লাহ্ যে ওয়াদাই করে তা পূরণ করে।

(৫) ইচ্ছার বিনাশকারী বান্দাহর সামনে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির বিস্ময়গুলো উন্মুক্ত করে দেন। ফলে তারা তা অনায়াসে বলতে পারেন যা অন্যরা পারেন না। এমন কি নবি-রাসুলগণ যা পারেন তারাও তা পারেন তবে তারা নবুয়ত ও রেছালাতের পদে পৌঁছতে পারেন না। পবিত্র কুরআনে সুরা বাকারায় ইরশাদ হয়েছে :

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾

অর্থাৎ ক্ষমতার জগতে আল্লাহ্ তায়ালা অনন্ত। তিনি নির্দিষ্ট শর্ত ও গুণের লোককে তাঁর কুদরাতের নমুনা দেখাতে পারেন। এ জন্যে কোনো অলি

নবি হয়ে যাবেন না। কারণ অলিগণ কখনো নবি হতে পারেন না। অলির ক্ষমতা যেখানে শেষ নবির ক্ষমতা সেখান থেকে শুরু।[৬]

আল্লামা শেখ সাদী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন :

رشتۂ برای گردنم افکندہ دوست

می بر کشد ہر جاکہ خاطر خواہ اوست

অর্থাৎ প্রেমাস্পদ তার প্রেমিকের গলায় প্রেমের রশি ঝুলিয়ে দেন। আর সে রশি ধরে প্রেমাস্পদ তার প্রেমিককে যেখানে নিয়ে যেতে পারেন; যা ইচ্ছে করাতে পারেন। তবে মকাম ঠিক থাকবে।

কুপ্রবৃত্তির লয় ও সুপ্রবৃত্তির উদয় : তরীকতের পরিভাষায় "নফ্স" বা আত্মা দু'ধরনের : একটা "নফ্সে লাউয়ামাহ্" তথা কুপ্রবৃত্তি। অপরটি নফ্সে মুৎমায়িন্নাহ" তথা সুপ্রবৃত্তি। কুপ্রবৃত্তি তৎপর থাকলে বান্দাহ্ প্রায়শ লোভ-লালসায় বশীভুত হয়। ফলে অবৈধ ও গর্হিত কাজে জড়ায়। তখন সুপ্রবৃত্তি কাজ করে না।

এ ক্ষেত্রে মুর্শিদে কামেলের সোহ্বত পেলে কুপ্রবৃত্তি দমতে শুরু করে। মুর্শিদে কামেলের সুহ্বত বান্দাহকে ক্রমান্বয়ে "ফানা আনিল্ খল্ক" পর্যায়ে উন্নত করে। তখন তার কুপ্রবৃত্তি আর কাজ করে না; বরং সুপ্রবৃত্তিই শুধু তৎপর হয়ে যায়। তখন বান্দার কাছে নামায ভালো লাগবে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল যা পছন্দ করেন- এমন কাজ করতে ইচ্ছে করবে। অন্যায়-অপরাধকে ঘৃণা করবে।

পবিত্র বুখারি শরিফে বর্ণিত হয়েছে :

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى . صحيح البخاري - ٤٧١/٢)

অর্থাৎ : যখন আযান দেওয়া হয় শয়তান বায়ু ছাড়তে ছাড়তে দৌড়ে পালায়। এতে সে আযানের ধ্বনি শুনতে পায় না। আযান শেষ হলে সে

[৬] ফাত্হুল্ গুয়ুব: পৃ : ৫৮০।

ফিরে আসে। এভাবে একামত হলে সে পালায়। আর একামত শেষ হলে সে ফিরে আসে। তখন নামাযির মনে কুমন্ত্রণা দেয়। মনকে নামাযির নিয়ন্ত্রণে থাকতে দেয় না। তাকে এ কথা সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; অথচ সে কথাগুলো তার মনের ধারে কাছেও ছিল না। ফলে তার মনে থাকে না– সে কত রাকআত পড়েছে।

আলোচ্য হাদিসের মূল উপজিব্য হলো : কুপ্রবৃত্তির অপতৎপর তার কুপ্রভাব। আর সেটা দমানোর মোক্ষম হাতিয়ার হলো : খাঁটি মুর্শিদের অনুসরণ। সে অনুসরণ দ্বারা বান্দার "ফানা আনিল এরাদা" অর্জন হয়। সে অবস্থায় কুপ্রবৃত্তি কোনোভাবেই নামাযে বিঘ্ন ঘটাতে পারে না। আল্লামা রুমি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন :

بس ستارہ آتش از آہن جہید + وآن دل سوزیدہ پذرفت وکشید

لیک در ظلمت یکی دزدے نہان + می نہد آنگشت .براستارگان

অর্থাৎ, আমাদের অজ্ঞতা ও উদাসীনতার অন্ধকারে নফ্স ও শয়তান এমন কৌশলে লুকিয়ে থাকে যাতে আমরা নেক আমলের নূর থেকে বঞ্চিত থাকি।

মওলানা আরও বলেন :

چوں عنایاتت بود باما مقیم + کی بود بیمی ازان دزد لئیم

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদের সাথে যদি আপনার অনুগ্রহ ও সাহায্য থাকে তবে দুষ্ট চোর আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।

گرہزاراں دام باشد ہر قدم + چوں تو بامائے نباشد ہیچ غم

অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তি দমন করে দেয়া আল্লাহ্ তায়ালার জন্যে মোটেও কঠিন নয়; যদিও তারা হাজার হাজার ফাঁদ পাততে থাকে।

মওলানা রুমি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) কুপ্রবৃত্তিকে দোযখ বলেছেন। কারণ কুপ্রবৃত্তির চাহিদার কোনো সীমা নাই। যেভাবে দোযখের চাহিদারও সীমা নাই। দোযখের শব্দ হলো– هَلْ مِنْ مزيدٌ + هَلْ من مَزيد অর্থাৎ আরও বেশি চাই, আরও বেশি চাই।

তিনি আরও বলেন :

چونکہ جزودوزخ است این نفس ما + طبع کل دارد ہمیشہ جزوہا

অর্থাৎ আমাদের কুপ্রবৃত্তিটা হলো মূল দোষখেরই শাখা; আর শাখা তার মূলেরই স্বভাবধারী হয়।

তাই, ঈমানদারকে চাহিদার বিনাশ ঘটিয়ে তথা "ফানা আনিল ইরাদা" করে পরিত্রাণ লাভ করতে হবে।

সুপ্রবৃত্তির উদয়নে খাঁটি পীরের ভূমিকা : মওলানা বলেন, "ফানা আনিল এরাদা"র মকাম লাভ করা সহজ হয়– কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক আমল করলে এবং খাঁটি পীরের সোহবত গ্রহণ করলে।

মওলানা বলেন,

چوں تعلق یافت نان بابوالبشر + نان مردہ زندہ گشت و باخبر

অর্থাৎ যেভাবে মৃত রুটি মানুষের খাবার হয়ে দেহে ঢুকলে সেটা মানব শরীরের অংশ হয়ে যায়; সেভাবে কুপ্রবৃত্তির কারণে মনুষ্যত্ব ও ঈমানহারা মানুষ খাঁটি মুর্শিদের সোহবতে গেলে তাঁর অংশে পরিণত হয়ে যায়।

মওলানা আরও বলেন :

موم وہیزم چون فدائے نار شد + ذات ظلمانی او انوار شد

অর্থাৎ মোম আর শুকনা লাকড়ি একে অন্যকে কাছে পেলে তার অন্ধকার দূরীভূত হয়ে উভয়ে আলো হয়ে যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, খাঁটি পীর ব্যতীত সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ অধ্যয়ণ পূর্বক জ্ঞানী হতে চাইলে ঈমান হারা হওয়ার আশঙ্কা থাকে; কারণ কুরআন-সুন্নাহর দুর্বোধ্য শব্দ, নাসেখ, মানসুখ; মুক্বায়য়াদ-মোআক্কাদ; মুশকল-নস; হাকীকত মজায ইত্যাদির পার্থক্য শায়খ ছাড়া করা সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়ত : ঈমান-ইসলামের মকাম থেকে কুত্‌বিয়তের মকাম পর্যন্ত পাড়ি দিতে ইলমে জাহির দ্বারা সম্ভব হয় না। ইহার জন্যে ইলমে বাতেন আবশ্যক। আর এই ইলমে খাঁটি মুর্শিদের অন্তর দিয়ে প্রবাহিত হয়।

তৃতীয়ত : "ফানা আনিল এরাদা" বেলায়তের মকাম সমূহের একটি, সেটা ইলমে শরিয়তের সাথে সাথে ইলম তরিকতে উত্তীর্ণ হলে তবেই অর্জন হবে।

তাই, দেখা যায় : ইলমে জাহিরের অনেক মহা পণ্ডিতের চাহিদার শেষ নাই, তারা "আরও চাই, আরও চাই" নীতিতে অবশ্যই নিমজ্জিত। কারণ তাদের "ফানা আনিল এরাদা" র মকাম অর্জন হয় নাই।

পক্ষান্তরে ইলমে জালেরের সাথে সাথে যারা ইলমে বাতেনে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের কোনো চাহিদা নাই। মানুষ দিতে চায় আর তারা নিতে চায় না। তাদের চাহিদা শুধু আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য। তাই, প্রিয় রাসুলের সর্বশেষ বাণী ছিল :

اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى- اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমিই আমার মহান বন্ধু। আমি তোমার সান্নিধ্য চাই।

প্রিয় রাসুল ইন্তিকালের পূর্ব মুহূর্তে যৎ কিঞ্চিৎ সম্পদ তথা একমাত্র ক্রীতদাসটি মুক্ত করে দেন। আরোহণের একমাত্র বাহনটি সদকা করে দেন। মুমিন জননীগণ এবং পবিত্র আওলাদকে আল্লাহ্‌র সোপর্দ করে দেন। হুজরা শরিফকে মারকাজ শরিফ করে দেন। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাই তাঁর অভাষ্ট লক্ষ্য ও কাম্য অবধারিত করেন। এটাই হলো- 'ফানা আনিল এরাদা'।

লেখক :

প্রভাষক (আরবি)
সোবহানিয়া আলিয়া কামিল (এমএ) মাদ্‌রাসা
৩১৫, আসাদগঞ্জ রোড, পাথরঘাটা, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম।

স্বনির্ভর সমাজ গঠনে 'ফানা আনিল খাল্‌কে'র ভূমিকা

✍ হাফেজ মুহাম্মদ ওসমান গণি

ভূমিকা :

মানুষ জন্মগতভাবে সামাজিক জীব। বিচ্ছিন্ন মানবজীবন কল্পনা করা যায়না; এটা অসম্ভবও বটে। বস্তুত সমাজবদ্ধভাবে জীবন-যাপন করা মানুষের স্বভাবগত ও প্রকৃতিগত ব্যাপার। মানুষের জীবন ধারণের জন্য অন্যের সহযোগিতা প্রয়োজন, কারণ মানুষের একক ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্য একেবারেই সীমাবদ্ধ; অথচ সেই তুলনায় তার পার্থিব চাহিদা ও প্রয়োজন বিপুল ও ব্যাপক। তাই সে অন্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতার প্রতি মুখাপেক্ষী; কিন্তু কোনো মানুষ সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী ও পর নির্ভরশীল হয়ে থাকলে সে কখনও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, পারে না জীবনে অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছতে। এমনকি সকলের একমাত্র রিযিকদাতা ও সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকাও আল্লাহ নিষেধ করেছেন। বরং তাকে রিযিকের অন্বেষণে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তবেই আল্লাহ্ তায়ালা তাকে রিযিক দান করবেন এবং সে স্বনির্ভর হতে সক্ষম হবে।

স্বনির্ভর সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা :

পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য তথা তাঁর ইবাদত-বন্দেগি একনিষ্ঠতার সাথে পালন করতে হলে, একটি পূর্ণাঙ্গ স্বনির্ভর ইসলামি জীবন ব্যবস্থা গঠন অত্যাবশ্যক। এ কারণেই মক্কি জীবনে মুসলমানদের উপর আল্লাহ্ তায়ালা কোনো বিধি-বিধান নাযিল করেননি। মদনি জীবনে যখন মানুষের স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরতা প্রতিষ্ঠা হলো তখনই মহান আল্লাহ্ যাবতীয় বিধি-বিধান নাযিল করেছেন। পরাধীনতা ও পর নির্ভরশীলতা ইবাদত-বন্দেগির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বান্দা যখন নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য স্বনির্ভরতা অর্জনের চেষ্টা করে মহান আল্লাহ্ তখন তাকে সাহায্য করেন।

বেকারত্ব সমাজের জন্য, দেশের জন্য অভিশাপ এবং দেশ ও জাতির উন্নয়নে প্রধান বাধা। পক্ষান্তরে, শিক্ষিত, কর্মঠ, আত্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী ও স্বনির্ভর ব্যক্তি দেশের সম্পদ ও উন্নয়নের চাবিকাঠি। অতএব, দেশের উন্নয়ন ও ধর্ম-কর্ম পালনের লক্ষ্যে দক্ষ জনগোষ্ঠী ও স্বনির্ভর সমাজের বিকল্প নেই।

কুরআন-হাদিসের আলোকে স্বনির্ভরতার গুরুত্ব :

মহান আল্লাহ্ ইবাদত শেষ করে মানুষকে স্বনির্ভর হওয়ার জন্যে আল্লাহ্র অনুগ্রহ তথা আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক অন্বেষণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ

"নামায শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ (রিযিক) সন্ধান করো।" (সূরা জুমুআ : ১০)

অন্যত্র বলেছেন :

فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ

"অতঃপর তোমরা আল্লাহ্র নিকট জীবনোপকরণ কামনা করো এবং তাঁরই ইবাদত করো আর, তাঁরই প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (সূরা আনকাবুত : ১৭)

উপরি উক্ত আয়াত দু'টিতে একমাত্র মহান আল্লাহ্র নিকট রিযিক অন্বেষণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ তিনিই একমাত্র সমগ্র সৃষ্টিকুলের রিযিকদাতা।

মানবজীবনে জীবিকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিকে জীবিকার জন্য পরিশ্রম ও চেষ্টা করা শুধু কর্তব্যই নয় বরং ইবাদতও বটে। হযরত রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

طَلَبُ كَسْبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ.

"হালাল রুযি অন্বেষণ করা অত্যবশ্যক ফরযের পর একটি ফরয।" (বায়হাকী, সূত্র. মিশকাত, পৃ: ২৪২)

সুতরাং, বৈধ পন্থায় হালাল উপার্জনের জন্য পরিশ্রম করা এবং স্বনির্ভরতা অর্জন করার গুরুত্ব অপরিসীম।

স্বনির্ভরতার প্রতি উৎসাহ প্রদান :

বেকারত্ব মানুষকে বিপদগামী করে তোলে, সমাজকে কলুষিত করে এবং দেশকে পেছনের দিকে ঠেলে দেয়। বেকার মানুষকে নিজের খুব আপনজনও ঘৃণা করে। অলস ও কর্মবিমুখ মানুষ কখনও সফলতার মুখ দেখে না। কথায় আছে "অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।" প্রবাদ আছে যে, "পরিশ্রমে ধন আনে পুণ্যে আনে সুখ, আলস্যে দারিদ্র আনে পাপে আনে দুখ।" সুতরাং অলসতা পরিহার করে পরিশ্রম করে, স্বনির্ভরতা অর্জনের প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

ইসলামও মানুষকে কর্মজীবী ও স্বনির্ভর হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছে। হযরত রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "তোমাদের কারও পিঠে কাঠের বোঝা বহন করে এনে বিক্রয় করাটা কারো কাছে কিছু ভিক্ষা চাওয়া অপেক্ষা উত্তম। কেননা, ভিক্ষুককে কেউ দিতে পারে, আবার না-ও দিতে পারে।" (সহিহ বুখারি, সূত্র. রিয়াদুস সালেহিন, পৃ. ২৫৬, হাদিস নং ৫৪০ ও মিশকাত, পৃ : ১৬২, হাদিস নং ১৮৪১)

অপর হাদিসে বর্ণিত আছে : নিজ হাতে উপার্জন করে খাওয়ার চাইতে উত্তম খাদ্য কেউ কখনও খায়নি। (বুখারি, সূত্র. রিয়াদুস সালেহিন, পৃ. ২৫৬, হাদিস নং ৫৪৩)

ইসলাম তথা নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বনির্ভরতাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ভিক্ষাবৃত্তিকে অনুৎসাহিত করেছেন এবং বহু হাদিসে ভিক্ষা-বৃত্তির ইহ ও পরকালীন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন– اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى "উপরের দাতার হাত নীচের গ্রহীতার হাত অপেক্ষা উত্তম।" (বুখারি ও মুসলিম, সূত্র. মিশকাত; পৃ. ১৬২ : হাদিস নং ১৮৪৩)

মানবতার অগ্রপথিক মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে কেবল নিবৃত্ত করতেন না বরং ভিক্ষা পেশা পরিহার করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য সহযোগিতাও করতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও রেখে গেছেন। এক ভিক্ষুককে তার একমাত্র সম্বল কম্বল ও পেয়ালা নিলামে বিক্রি করে, বিক্রিলব্ধ টাকা দিয়ে কুড়াল কিনে দিয়ে নিজ হাত মুবারক দ্বারা হাতল লাগিয়ে দেন এবং জঙ্গল থেকে লাকড়ি সংগ্রহ

করে বাজারে বিক্রি করার পরামর্শ দেন। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ, সূত্র. মিশকাত, পৃ. ১৬৩ : হাদিস নং ১৮৫১)

এর দ্বারা উক্ত ভিক্ষুকের ভাগ্য পরিবর্তন হলো সম্মানজনক ভাবে; কারণ ভিক্ষা করে হাজার টাকা উপার্জনের চেয়ে নিজের পরিশ্রমের উপার্জিত এক টাকার মধ্যে তৃপ্তি পাওয়া যায় বেশি। যারা ভিক্ষা করে তারা সারাজীবনই ভিক্ষা করতে থাকবে। কোনোদিনই সচ্ছল ও স্বনির্ভর হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনা।

নবি-রাসুলগণ মানবজাতির জন্য আদর্শ ও মডেল। তাঁরা প্রত্যেকেই স্বনির্ভর কর্মঠ ছিলেন এবং নিজের হাতে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কেউ কাঠ মিস্ত্রী, কেউ সেলাই কাজ, আবার কেউ যুদ্ধ পোশাক তৈরি করে তা বিক্রি করে হালাল রুযি উপার্জন করতেন।

স্বনির্ভর অর্জনের উপায় বা করণীয় :

ভালো ও সৎ কাজে মানুষ পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে মহান আল্লাহ্ও নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন :

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى

"আর তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালো কাজে এবং তাকওয়া অর্জনে সহযোগিতা করো।"(সূরা মায়িদাহ : ২)

জীবিকা উপার্জন একটি ভালো কাজ ও ইবাদত। সুতরাং, এ কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করা আল্লাহ্র নির্দেশের আওতায় পড়ে। তাছাড়া আরবিতে প্রবাদ আছে যে, اَلدُّنْيَا بِالْوَاسَائِلِ لَا بِالْفَضَائِلِ দুনিয়াতে কোন কাজে সফলতা অর্জন করতে হলে, কেবল মর্যাদা ও যোগ্যতা থাকাই যথেষ্ট নয় বরং কারও না কারও মাধ্যম বা সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। সুতরাং, পার্থিব জীবনে স্বনির্ভরতা অর্জনে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করা দূষণীয় নয় এবং 'ফানা আনিল খাল্কে'র বিপরীতও নয়। এ উদ্দেশ্যে বেকারত্ব দূর করার জন্য এবং স্বনির্ভরতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা আবশ্যক। বেকারত্ব দূরীকরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সমাজকে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন। সে জন্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং হাতে-কলমে কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে এর ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সমাজে

প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংস্থা এবং ধর্মীয় সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।

ইতোমধ্যে অনেক তরিকতপন্থি আধ্যাত্মিক সংগঠন স্বনির্ভর সমাজ গঠনে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হস্তশিল্প, পশুপালন, মৎস্যচাষ, গরিব-দুঃখী মানুষকে উপার্জনের সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করে আসছে এবং বিভিন্ন কর্মশালার মাধ্যমে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানবতার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাচ্ছে। তন্মধ্যে 'আঞ্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট' ও 'আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)' এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয়।

উপসংহার :

স্বনির্ভর সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সুশিক্ষিত ও কর্মঠ জাতি আবশ্যক। আর এতে সফলতা অর্জনের জন্য আত্মবিশ্বাস, অধ্যবসায় ও নিরলস প্রচেষ্টার প্রয়োজন। "পারিবনা কথাটি বলিয়ো না আর, একবার না পারিলে দেখো শতবার" নীতি অবলম্বন করতে হবে। নিজের উপর আস্থা ও আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই একজন মানুষ স্বনির্ভর হতে সক্ষম হবে। ফলে সমাজ 'ফানা আনিল খাল্‌ক' তথা পরমুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্তি লাভ করবে এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে সমাজ ও দেশের অগ্রযাত্রা দ্রুতগতিতে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছবে, যা যেকোনো দেশের দেশপ্রেমিক নাগরিকের একান্ত কাম্য।

লেখক :
আরবি প্রভাষক
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

অহংকার দাম্ভিকতা পরিহারে 'ফানা আনিল হাওয়া'র ভূমিকা

✍ কাজী মোহাম্মদ আমিন উল্লাহ মহিউদ্দিন জেহাদী

ভূমিকা : বিশ্বজনীন সুফিবাদী মরমি দর্শনের নাম হলো মাইজভাণ্ডারী দর্শন। মাইজভাণ্ডারী দর্শনের অন্যতম ভিত্তি হলো 'উছুলে ছাবয়া' বা 'আত্মশুদ্ধির সপ্তকর্ম পদ্ধতি'। 'উছুলে ছাবয়া'র মূল দাবি হল একজন মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাতের গুণাবলিতে গুণান্বিত হয়ে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা হওয়ার সাধনায় নিয়োজিত করে, পরিশুদ্ধ বান্দায় পরিণত করা। আল্লাহ্‌র প্রিয় বিশুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ বান্দা তৈরিতে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের 'ফানায়ে ছালাছা' বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তর যথাক্রমে "ফানা আনিল খাল্ক" 'ফানা আনিল হাওয়া' ও 'ফানা আনিল এরাদা' এর গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে মানবিক আদর্শ বিবর্জিত গুণ অহংকার ও দাম্ভিকতা পরিহারে 'ফানা আনিল হাওয়া'র গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে বিষয়ের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

'ফানা আনিল হাওয়া'র পরিচয় : আরবি **هوى** শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কানে বাতাসের শব্দ, বাসনা, ইচ্ছা, ঝোঁক, প্রবণতা, আগ্রহ, আবেগ, অনুরাগ, খেয়াল, কল্পনা, পক্ষপাত, প্রেম ভালোবাসা, প্রিয় বস্তু, পতিত হওয়া, ভেঙ্গে পড়া, মারা যাওয়া ইত্যাদি।

هوى এর পরিচয় : هوى হাওয়া এর পরিচয় দিতে গিয়ে মোহাদ্দেসিনে কেরাম ফোকাহায়ে ইজাম নিম্নোক্ত সংজ্ঞা বা পরিচয় দিয়েছেন :

আল্লামা ইবনুল জাওযির (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) মতে–[১]

الـهوى فى الاصل هوميل الـنّـفس الى ماتحب من الخير او الشرّ.

---

https://www almaany.com>ar-ar>...

[১] ذم الهوى لابن الجوزى ইন্টারনেট সূত্রে পাওয়া, পৃষ্ঠা নাম্বার পাওয়া যায়নি।

হাওয়া হলো মূলত আত্মা ভালো বা মন্দের প্রতি ধাবিত হওয়া।

আল্লামা ইবনে রজব (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) এর মতে–[২]

وقد يطلق الهوى بمعنى المحبّة والميل مطلقًا فيدخل فيل الميل الى الحق غيره

হাওয়াকে সাধারণভাবে ভালোবাসা এবং প্রবণতা অর্থে ব্যবহার করা হয়। 'ধাবিত হওয়া' এটির মধ্যে সত্যের প্রতি ধাবিত হওয়া যেমন অন্তর্ভুক্ত তেমনই অন্যান্য জিনিসের প্রতি ধাবিত হওয়াও অন্তর্ভুক্ত।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় হাওয়া আবেগ, বা আত্মা ধাবিত হওয়া, এটি ভালো কাজের দিকে যেমন ধাবিত হয়, তেমনি মন্দ কাজের দিকেও ধাবিত হয়। তবে সাধারণত হাওয়া নফ্সের মন্দ কাজের প্রতি ধাবিত হওয়ার দিকে বেশি ব্যবহৃত হয়। কুরআনুল করিমে এই অর্থে 'হাওয়া' শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কু-প্রবৃত্তির আনুগত্য থেকে মুক্ত ব্যক্তির জন্য জান্নাতের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ বলেন :

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٤١﴾

"যে তার প্রতিপালকের অবস্থানকে ভয় করেছে এবং নিজেকে প্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করেছে তার আশ্রয়স্থল হল জান্নাত।" (সূরা আন্ নাযিয়াত : ৪০–৪১)

কু-প্রবৃত্তির প্রতি আনুগত্যে মগ্ন ব্যক্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করার প্রতি কঠোর নির্দেশ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

"আপনি তার কথা মানবেন না যার হৃদয়কে আমি আমার স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছি ও যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কার্যকলাপ বাড়াবাড়ি।" (সূরা কাহাফ : ২৮)

কু-প্রবৃত্তির অনুসরণকারী ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী পথভ্রষ্ট। একথা ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٠﴾

"আর আল্লাহ্র পথ নির্দেশনা ছাড়া যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।" (সূরা ক্বাসাস : ৫০)

---

[২] العلوم والحكم ইন্টারনেট সূত্রে পাওয়া, পৃষ্ঠা নাম্বার পাওয়া যায়নি।

তাই মুমিনের অন্যতম বর্জনীয় বিষয় হলো প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং যেকোনো অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা, কাজকর্ম থেকে নিবৃত থাকা। যেমন হযরত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন :

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ

"ব্যক্তির সুন্দরতম ইসলাম হলো অপ্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় বর্জন করা।" (বোখারি শরিফ, হাদিস নং-২৫৬, তারিখুল কবির, ৪র্থ খণ্ড, ২২০পৃষ্ঠা, তিরমিযী শরিফ, হাদিস নং ২৩১৭, ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৯৭৬)

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে সমস্ত কাজ বা আচরণ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল, আউলিয়ায়ে কেরাম এবং সাধারণ মানুষের নিকট মন্দ কাজ হিসেবে স্বীকৃত সে সকল কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখার নাম হলো "ফানা আনিল হাওয়া" যা মাইজভাণ্ডারী দর্শনের অন্যতম অংশ। মানব জীবনে বহুমুখী মন্দ কাজের মধ্যে অহংকার ও দাম্ভিকতা অন্যতম। যা নিরোধ কল্পে কুরআন ও সুন্নাহ্ জোর তাগাদা দিয়েছেন।

কুরআন এবং সুন্নাহ্র কঠোর বিধি-নিষেধের পাশাপাশি সুফিয়ায়ে কেরাম এবং আউলিয়ায়ে কেরাম অহংকার ও দাম্ভিকতা পরিহারের ব্যাপারে কঠোর বিধি-নিষেধ দিয়েছেন। কেননা অহংকার-দাম্ভিকতা, আমিত্ব, আত্ম অহমিকা, এমন এক মন্দ গুণ যা আত্মপরিচয়কে ভুলিয়ে দেয়। অনেক সময় সৃষ্টি হিসেবে স্রষ্টার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে গাফেল হয়ে পড়ে। আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে বিভেদ, বৈষম্য ও বর্ণবাদকে উসকে দেয়। কখনও কখনও মানব হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত করে। নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করতে গিয়ে অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। কখনও কখনও আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্বকে ভুলে যায়।

আত্মার ব্যাধিসমূহের মধ্যে অহংকার ও আত্মম্ভরিতা হচ্ছে গুরুতর একটি ব্যাধি। দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বপ্রথম অহংকার ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করেছে শয়তান। এ সম্পর্কে কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে :

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿١٢﴾

"আমি তার (আদম) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তুমি আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছো এবং তাকে কর্দম দ্বারা সৃষ্টি করেছো।" (সূরা আ'রাফ : ১২)

অহংকার পতনের মূল। অহংকারীকে কেউ পছন্দ করে না বরং ঘৃণা করে।

যেমন : শয়তান অহংকার করার কারণে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শাস্তির অধিকারী হয়েছেন। যেমন কুরআনুল কারিমে বর্ণিত হয়েছে :

اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٤﴾

"সে (শয়তান) অস্বীকার করল এবং অহমিকা দেখাল; ফলে সে কাফেরদের দলভুক্ত হলো।" (সূরা বাকারা : ৩৪)

শয়তানের এমন ধৃষ্টতা দেখানোর পর আল্লাহ্ তায়ালা শয়তানকে চূড়ান্ত শাস্তি দিতে গিয়ে বলেন :

فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ﴿١٣﴾

"তুমি এই স্থান হতে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করবে তা হতে পারেনা। সুতরাং, বের হয়ে যাও। তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা আ'রাফ : ১৩)

শয়তানের আদর্শে আদর্শবান হয়ে যদি কেউ অহংকার করে আল্লাহ্ তাকে পছন্দ করেন না।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿١٨﴾

আল্লাহ্ তায়ালা কেনো উদ্ধত-অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা লোকমান : ১৮)

অহংকারের কুফল : ইমাম গাজ্জালি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, অহংকার দ্বারা মানুষের হাজারো প্রকার ক্ষতি হয়; তন্মধ্যে চারটি হল উল্লেখযোগ্য :

১। অহংকারী সত্য লাভ হতে বঞ্চিত হয়। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ

"আমি দুনিয়ার না-হক অহংকারীদেরকে আমার নিদর্শন থেকে বিমুখ রাখবো।" (সূরা আ'রাফ : ১৪৬)

অহংকারীর অন্তরে আল্লাহ্ মোহরাঙ্কিত করে দেন। ফলে আল্লাহ্‌র আহকামের মারেফাত লাভের ব্যাপারে অন্তরে কালো পর্দা পড়ে যায়। যেমন আল্লাহ বলেন :

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾

"এভাবেই আল্লাহ্ অহংকারী ও দাম্ভিকদের অন্তরকে মোহরযুক্ত করে দেন।" (সূরা মু'মিন, আয়াত : ৩৫)

২। অহংকারীরা আল্লাহ্‌র প্রিয় হতে পারেনা। কেননা অহংকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। যেমন আল্লাহ বলেন :

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ অহংকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা নাহল, ২৩)

বর্ণিত আছে যে, হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) আরজ করলেন, হে আল্লাহ্! আপনি দুনিয়ায় কোন প্রকারের লোকের প্রতি বেশি অসন্তুষ্ট? আল্লাহ্ জবাবে বলেন, "যার অন্তরে অহমিকা রয়েছে এবং যার কথায় দাম্ভিকতা আছে।" (ইমাম গাজ্জালি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) মিনহাজুল আবেদিন : বাংলা, পৃ : ১২০)

৩। অহংকারীদের প্রাপ্তি দুনিয়া ও আখেরাতে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি। বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে গর্ব ও দম্ভ প্রকাশ করে আল্লাহ্ তাকে ন্যায়ভাবেই অপদস্ত করেন। (ইমাম গাজ্জালি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) মিনহাজুল আবেদিন, বাংলা, পৃ : ৩৪৪)

হাদিসে পাকে হযরত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ مَعَ الْجَبَّارِيْنَ- فَيُصِيْبُهُ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ الْعَذَاب .

"মানুষ নিজেকে সর্বদা বড়ো ভাবতে থাকে এভাবে সে একদিন আল্লাহ্‌র দরবারে দাম্ভিক অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তখন তার উপর ঐসকল আযাব-গযব নাযিল হতে থাকে, যা পূর্বেকার দাম্ভিকদের উপর নাযিল হয়েছিল।" (ইমাম গাজ্জালি রাহমাতুল্লাহে আলাইহি, মুকাশিফাতুল কুলুব, বাংলা, পৃ : ৩৪৪)

হযরত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও ইরশাদ করেন :

مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ أَوْ اخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

"যে ব্যক্তি অন্তরে নিজেকে বড়ো ভাবে, চাল-চলনে অহংকারী ভঙ্গি প্রদর্শন করে, সে ব্যক্তি যখন আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হবে, তখন আল্লাহ্‌পাক তার প্রতি রাগান্বিত থাকবেন।" (ইমাম গাজ্জালি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) মুকাশিফাতুল কুলুব, বাংলা- পৃ : ৩৪৮)

পৃথিবীতে দম্ভভাবে চলাচল না করার প্রতি নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন :

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿٣٧﴾

"পৃথিবীতে দম্ভভাবে পদচারণা করো না। নিশ্চয় তুমি তো ভূ-পৃষ্ঠকে কখনই বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না।" (সূরা বনি ইসরাঈল, ৩৭)

৪। অহংকারী নিশ্চিত জাহান্নামী। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ﴿٦٠﴾

"যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে অচিরেই তারা লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সূরা মু'মিন, আয়াত: ৬০)

হাদিসে কুদসিতে আছে, আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِيْ فَمَنْ يُنَازِعُنِيْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ وَلَا أُبَالِيْ

"অহংকার আমার চাদর; মহত্ত্ব ও বড়োত্ব আমার পায়জামা। অতঃপর এতদুভয়ের কোনো একটি নিয়ে যদি আমার সাথে টানাটানি করে, তাকে আমি কোনোপ্রকার ভয় ডরহীন ভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।" (মুসলিম শরিফ ও ইমাম গাজ্জালি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) মুকাশিফাতুল কুলুব, ১ম খণ্ড, পৃ : ৩৪৩)

অপর এক হাদিসে হযরত রাসলি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَال حَبَّة مِنْ خردَلٍ مِنْ كِبْر- أَكبَّهُ الله فِي النَّار على وَجْهِهِ .

"যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে আল্লাহ্ তাকে উলটামুখী জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।" (ইমাম গাজ্জালি রাহমাতুল্লাহে আলাইহি মুকাশিফাতুল কুলুব, ১ম খণ্ড, পৃ : ৩৪৩)

হযরত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাদিসে পাকে আরও ইরশাদ করেন :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ

"যে ব্যক্তির অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবেনা।" (মুসলিম শরিফ, মিশকাত শরিফ, পৃ : ৪৩৩)

ثَلاثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وهوى مُتْبِعٌ وَاَعْجَاب المرء بِنَفْسِهِ

তিনটি বিষয় ধ্বংসকারী। এক. কৃপণতা মানুষ যার অনুগত হয়। দুই. মানবিক প্রবৃত্তি, মানুষ যার অনুগামী হয়। তিন. আত্মপ্রীতি। (ইয়াহউ উলুমুদ্ দ্বীন, বাংলা, পৃ : ৬২৮)

দুনিয়াতে যেহেতু অহংকারীরা মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, অপমানিত করে, লাঞ্ছিত করে কেয়ামত দিবসে কোটি কোটি মানুষের সামনে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন। এ ব্যাপারে নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّـرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمْ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ

"কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে ছোটো পিপীলিকার ন্যায় একত্রিত করা হবে। কিন্তু আকৃতি হবে মানুষের। চারিদিকে তাদেরকে অপমান লাঞ্ছনা ঘিরে ধরবে। জাহান্নামের "বাওলাস" নামক এক কারাগারের দিকে তাদের হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। তাদের উপর আগুনের উপর আগুন হবে। তাদেরকে "তিনাতুল খাবাল" নামক দোযখিদের দেহ গলিত পচা রক্ত ও পুঁজ পান করানো হবে।" (মিশকাত শরিফ, পৃ : ৪৩৩; আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ২৫৫, ই.ফা. প্রকাশন)

অপর এক হাদিসে হযরত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : "মানুষ নিজেকে এত উচ্চে নিয়ে যায় যে, পরিণামে সে অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ফলে সে আযাবের অংশীদার হয় যে আযাব অহংকারীরা লাভ করে।" (ইয়াহউ উলুমুদ্দীন, পৃ. ৬৩০)

অপর এক হাদিসে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলেন, হযরত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, বেহেশত ও দোযখ পরস্পর বাদানুবাদে লিপ্ত হলো। দোযখ বলে পরাক্রমশালী এবং অহংকারীরা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। বেহেশত বলে উঠল দূর্বল ও দরিদ্ররা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। (তাদের বাদানুবাদ দেখে) আল্লাহ্ বেহেশতকে বলেন, তুমি আমার রহমত। যাকে ইচ্ছা আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করাবো। অতঃপর আল্লাহ্ দোযখকে বলেন, তুমি হলে আমার আযাব, আমি যাকে ইচ্ছা তোমার মাধ্যমে শাস্তি দেবো, তোমাদের উভয়কে পূর্ণ করিব। (আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ২৫৬, ই.ফা. প্রকাশন)

অহংকার হলো শয়তানের পাতানো ফাঁদ। হযরত হায়সাম ইবনে মালিক (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) তাই বলেন আমি হযরত নুমান ইবনে বাশির (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, শয়তানের অনেক রকম জাল ও ফাঁদ রয়েছে। শয়তানের ঐসব জাল ও ফাঁদ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র নিয়ামত পেয়ে অহংকার করা, আল্লাহ্‌র দানের জন্য গর্ববোধ করা, আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর অহংকার করা এবং আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ বা দাসত্ব করা। (আদাবুল মুফরাদ : ২৫৪ : পৃষ্ঠা, ই.ফা. প্রকাশন)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হতে বর্ণিত : তিনি বলেন, হযরত রাসুলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন হযরত নুহ (আলাইহিস সালাম) এঁর মৃত্যুর সময় তার দুই ছেলেকে ডেকে বলেন, আমি তোমাদেরকে দুটি বিষয়ে নিষেধ করছি এবং দুটি বিষয়ের প্রতি আদেশ দিচ্ছি। তোমরা শিরক এবং অহংকার থেকে বিরত থাক। কলেমায়ে তাইয়্যেবার অনুসরণ কর। কারণ আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে সবকিছু যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং কালিমায়ে তাইয়্যেবা অন্য পাল্লায় রাখা হয় তাহলে কালিমায়ে তাইয়্যেবার পাল্লা ভারী হবে। দ্বিতীয় যে বিষয়ের আদেশ দিচ্ছি তা হলো– "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি" কেননা এর মাধ্যমে প্রত্যেককে রিযিক দেওয়া হয়। (ইয়াহউ উলুমুদ্দিন : ৬৩০ পৃষ্ঠা; বঙ্গানুবাদ মিনা প্রকাশনী)

অপর এক হাদীসে হযরত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "জাহান্নামে 'মুহিব' নামক একটি জঙ্গল রয়েছে। আল্লাহ্‌ পাকের ইচ্ছা অহংকারীরা বসবাস করুক।" (ইয়াহউ উলুমুদ্দিন : ৬৩১ পৃষ্ঠা; বঙ্গানুবাদ মিনা প্রকাশনী)

অপর এক হাদিসে হযরত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তিনটি বিষয় থেকে মুক্ত থেকে মারা যাবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। ১. অহংকার ২. ফরয পরিত্যাগ ৩. খিয়ানত তথা বিশ্বাস ভঙ্গকরণ। (প্রাগুক্ত)

অহংকার সম্পর্কে বিভিন্ন মনিষীর বাণী :

- হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলেন, এক মুসলমান যেন অপর মুসলমানকে হেয় প্রতিপন্ন না করে। কেননা মুসলমানদের মধ্যে যে ছোটো সে আল্লাহ্‌র নিকট বড়ো।

- হযরত ওয়াহাব (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা "জান্নাতুন আদন" সৃষ্টি করার পর তার দিকে তাকিয়ে বলেন, অহংকারী ব্যক্তির জন্য তুমি হারাম।
- হযরত হাসান (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, আশ্চর্যের বিষয় : মানুষ প্রতিদিন একবার অথবা দু'বার নিজ হাতে পায়খানা ধৌত করে এরপরও অহংকার করে এবং আকাশ ও জমিনে যিনি প্রভাবশালী তার মোকাবিলা করে।
- হযরত মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, মানুষের অন্তরে যে পরিমাণ অহংকার বা দাম্ভিকতা আসে, সে পরিমাণ জ্ঞান বুদ্ধি কমে যায়। গর্ব অল্প হলে বুদ্ধির ক্ষতিও অল্প হবে এবং বেশি হলে বেশি।
- হযরত সালমান ফারসি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, সেই নিকৃষ্ট কাজ কোনটি যার ফলে সৎকর্ম আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয় না? তিনি বলেন, অহংকার।
- হযরত নুমান ইবনে বাশির (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, শয়তানের অনেক ফাঁদ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি হলো আল্লাহ্র নিয়ামত পেয়ে অহংকার করা এবং মনের ইচ্ছার অনুসরণ করা। (ইমাম গাজ্জালি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি); ইয়াহউ উলুমুদ্দিন : ৬৩০ পৃষ্ঠা বঙ্গানুবাদ মিনা প্রকাশনী)

অহংকার বিষয়ে আল্লামা জালাল উদ্দিন রুমি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) এঁর অভিমত :

আল্লামা জালাল উদ্দিন রুমি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) তাঁর রচিত মসনবি শরিফে ইরশাদ করেন। তোমরা কখনও তোমাদের আত্মায় অহংকারের বীজ অঙ্কুরিত হতে দিওনা। কেননা এই অহংকার তোমাকে ধ্বংস করবে।

আল্লামা রুমি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, সুনাম সুখ্যাতি যোগ্য গুণাবলী তোমার মধ্যে সৃষ্টি হলেও তা ছড়াতে চেষ্টা না করে- গোপন রাখতে যত্নবান হও। সুনাম-সুখ্যাতি ছড়ালে বাহ্যিক শত্রু সৃষ্টি হওয়া এবং তার আধিক্য অনিবার্য। প্রকৃত শত্রু নফ্স ও শয়তান তোমার মধ্যে গর্ব অহংকার সৃষ্টি করে, তোমাকে ধ্বংস করার মহা সুযোগ পেয়ে বসবে। পক্ষান্তরে, অপ্রসিদ্ধ অবস্থায় লুকিয়ে থাকতে পারলে উক্ত সব অনিষ্ট থেকে

রক্ষা পাওয়া যাবে এবং তোমার মধ্যে নানা রকম মহত্ব জন্ম নেবে। যেমন- আল্লামা রুমি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন :

دانہ باشی مرغکانت برچنند
غنچہ باشی کودکانت برکنند

যদি তুমি শস্য-বীজ হও তবে পাখিকুল তোমাকে খেয়ে ফেলবে, তুমি যদি কলি বা ফুল হও তবে ছেলে মেয়েরা ছিঁড়ে নিবে।

دانہ پنہاں کن بہ کلی دام شو
غنچہ پنہاں کن گیاہ بام شو

অতএব, (তোমার) শস্য বীজ (জন্মালেও) তা লুকিয়ে রাখো (যেন তুমি পাখির গ্রাস না হও) তুমি জাল বা ফাঁদ হয়ে যাও (দেখবে কত সুন্দর সুন্দর পাখি তোমার মধ্যে আটকা পড়বে) তোমার মধ্যে কলি বা ফুল (জন্মালেও তা) লুকিয়ে রাখো এবং ফুল বিহীন ঘাস হয়ে থাক যা ছিঁড়ে নেওয়া হয় না।

ہر کہ دادا و حسن خود را در مزاد
صد قضائے بد سوئے او رو نہاد

যে ব্যক্তি নিজ গুণাবলিকে প্রসিদ্ধির জন্য অধিক সুযোগ করে দেয়, তার ভাগ্যে শত শত অশুভ প্রতিক্রিয়া প্রস্ফুটিত হয়। (আল্লামা রুমি রাহমাতুল্লাহে আলাইহি মসনবি শরিফ, বঙ্গানুবাদ, মিনা প্রকাশনী, ৪৩৪-৪৩৫পৃষ্ঠা)

সুনাম সুখ্যাতি, মান-সম্মান ছড়িয়ে পড়লে লোক সমাগম বেশি হয়। তারা মানপত্র দেয়, মাল্য ভূষিত করে, নানান রকমের প্রশংসা করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই গর্ব অহংকার বোধ হতে থাকে। যা মানবাত্মার আল্লাহ্মুখী উন্নতির পথে কঠিন প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে সুনাম সুখ্যাতি, মান-সম্মান প্রসিদ্ধি ছাড়া অখ্যাত অপরিচিত হয়ে থাকতে পারলে, উপরি উক্ত সকল আত্মিক রোগ থেকে মুক্ত থেকে উন্নতির ও কল্যাণের পথে ধাবিত হওয়া যায়। এ ব্যাপারে আল্লামা রুমি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন,

تن قفص شکل است تن شد خارجاں
در فریب داخلاں وخارجاں

দেহ (মানবাত্মার জন্য) পিঞ্জর স্বরূপ, তাই তা (স্বার্থপর প্রশংসাকারী) যাতায়াতকারীদের ধোঁকাবাজির কারণে মানবাত্মার (উন্নতির পথে) প্রতিবন্ধক হয়।

اینش گوید من شوم ہمراز تو
وانش گوید نے منم انباز تو

একজন বলে, (আপনার তুল্য মানুষ কোথাও দেখিনি) আমি আপনার চিরবন্ধু হয়ে থাকব, আর একজন বলে, আপনার ন্যায় মানুষ কোথাও পাইনি, আমি আপনার চিরসাথী।

اینش گوید نیست چوں تو در وجود
در جمال و فضل و در احسان وجود

একজন বলে সমগ্র জগতে আপনার সমকক্ষ কেউ নেই, উৎকর্ষেও নয় মান মর্যাদায়ও নয়, পরোপকার এবং দানশীলতায়ও নয়।

اینش گوید ہر دو عالم آں تست
جملہ جانہاماں طفیل جان تست

একজন বলে, উভয় জগৎ তো আপনার করতলগত, আমাদের সকলের জীবন তো আপনার জীবনের ছায়াতলে আশ্রিত।

اینش گوید گاہ عیش وخرمی
آنش گوید گاہ نوش وہمدمی

একজন বলে, আপনি আমাদের শান্তি ও আনন্দের স্থল, আরেকজন বলে, আপনি আমাদের খানাপিনা, ফুর্তি ও সমবেদনার কেন্দ্রস্থল।

اوچو بیند خلق را سر مست خویش
از تکبر میرود از دست خویش

(বিভিন্ন লোকের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রশংসা প্রাপ্ত) লোক যখন দেখে বহু লোক তার প্রতি ভক্তি ভালোবাসায় পাগলপারা তখন তার গর্ব অহংকার নিজের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়।

اونڈ ند کہ ہزاراں چوں او
دیو افگند ست اندر آب جو

অহংকারী ব্যক্তি তখন খেয়াল করে না যে, তার ন্যায় হাজার হাজার লোককে শয়তান অহংকারী বানিয়ে ধ্বংসের হ্রদে ডুবিয়ে দিয়েছে।

لطف وسالوس جہاں ہوش ایست

کمترش خور کو پرآتش لقمہ ایست

লোকমুখের চাটুকারিতা মূলক উক্তি অতীব মজার খাদ্য; কিন্তু তা যথাসাধ্য কম ভক্ষণ করো। কারণ তা মূলত অগ্নিগ্রাস।

آتشش پنہاں وذوقش اشکار

دود اوظاہر شود پایان کار

অহংকারের আগুন গোপন, তার স্বাদ প্রকাশ্য, পরিণামে তার ধোঁয়া প্রকাশ পাবে।

মানুষের ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রশংসা ব্যক্তির কাছে খুবই ভালো লাগে। কিন্তু এর মাধ্যমে যে অহংকার সৃষ্টি হয়, তার পরিণাম হবে দোযখের আগুন। তার আনন্দ অতি প্রকাশ্য, কিন্তু ক্ষতির দিকটা অপ্রকাশ্য শেষ পর্যন্ত সেটি গোপন থাকবে না যখন জাহান্নামে অহংকারের জন্য আযাব দেওয়া হবে। (আল্লামা রুমি রাহমাতুল্লাহে আলাইহি, মসনবি শরিফ, বঙ্গানুবাদ, মিনা প্রকাশনী, ৪৩৯–৪৪৫)

অহংকারের কারণ :

ইমাম গাজ্জালি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, মানুষ সাধারণত সাতটি গুণবলী নিয়ে অহংকার করে, তন্মধ্যে দুটি হলো দ্বীনি। যথা:- ১. ইলমের ২. ইবাদত ও আমলের বাকিগুলো দুনিয়াবি। তা হলো : ৩. বংশের ৪. সৌন্দর্যের ৫. সম্পর্কের ৬. শক্তিসামর্থের ৭. অনুসারী ও সাহায্যকারীদের। (ইমাম গাজ্জালি রাহমাতুল্লাহে আলাইহি, তাশকিলে কিরদার, উর্দু : পৃ. ২০৮)

অহংকার থেকে বাঁচার উপায় :

১. সর্বদা নিজেকে ছোটো ও নগণ্য মনে করা।

২. নিজের সৎ গুণাবলি গোপন রাখার মাধ্যমে বিনয়ী থাকা।

৩. নিজের চেয়ে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া।

৪. অন্যের ভালো কাজের প্রশংসা করা।

৫. অহংকারীকে মনে করতে হবে, তার অহংকারের বস্তুটি খোদা প্রদত্ত তার নিজের নয়।

৬. নফ্সের চাহিদার বিপরীত কাজ করা; যেমন : একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) মাথায় লাকড়ির বোঝা নিয়ে লোক সম্মুখে বাজারে গমন করেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো আল্লাহ্ আপনাকে উচ্চতর মর্যাদা দান করেছেন তা সত্ত্বেও আপনি কেন এই কষ্ট করছেন। উত্তরে তিনি বলেন, اردت ان ادفع كبر عن نفسى আমি আমার নফ্স হতে অহংকার দূর করার চেষ্টা করছি। (ইমাম গাজ্জালি রাহমাতুল্লাহে আলাইহি, মুকাশিফাতুল কুলুব : বাংলা, পৃ. ১২)

৭. নিজেকে এবং আল্লাহকে চিনতে হবে।

৮. মানবের সৃষ্টি এক ফোঁটা নাপাক তরল বীর্য থেকে এবং সমাপ্তি তথা মৃত্যু দুর্গন্ধময় গলিত লাশ দ্বারা।

৯. অহংকারের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে কুরআন হাদিসের বর্ণনা পাঠ করা।

১০. হক্কানি ও রাব্বানি পীর মাশায়েখ ও আলেম ওলামার সান্নিধ্যে গমন করা।

১১. মনে রাখতে হবে : অহংকার নিম্নশ্রেণির লোকেরাই করে। বিনয় নম্রতা অভিজাত ও উচ্চ পর্যায়ের। (ইমাম গাজ্জালি রাহমাতুল্লাহে আলাইহি., মুকাশিফাতুল কুলুব, বাংলা : পৃ. ১২৮)

১২. ইবাদত বন্দেগিতে লিপ্ত থাকা।

১৩. কবরের একাকিত্ব ও তার শাস্তির কথা স্মরণ করা।

১৪. অধঃস্তন লোকদের জীবন নিয়ে চিন্তা করা।

১৫. গরিব, বিকলাঙ্গ, অসচ্ছল, অভাবী, অসুস্থ লোকদের দেখে নিজের ভালো দিকের জন্য শোকরিয়া আদায় করা।

অতএব আমাদের উচিত অহংকার মুক্ত জীবন গঠন করা; ইহকাল এবং পরকালের সফলতা লাভের জন্য চেষ্টা করা।

লেখক :

প্রভাষক, কামালে ইশকে মোস্তফা (রাদিয়াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফাজিল মাদ্রাসা
বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।

ভোগবিলাস ও আত্মতৃপ্তি পরিহারে 'ফানা আনিল হাওয়া'-র বিশেষ অবদান

✍ মুহাম্মদ আলী আছগর

মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রবর্তক গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) [১৮২৬-১৯০৬ খ্রি:] 'উছুলে ছাবয়া' বা 'সপ্তকর্ম পদ্ধতি' প্রবর্তন করেন। এই সপ্তকর্ম পদ্ধতি মানুষের ষড় রিপু দমনে একটি কার্যকর ও শক্তিশালী কর্ম নীতি। এই 'উছুলে ছাবয়া' বা 'সপ্তকর্ম পদ্ধতি' তিন প্রকার ফানা (বিনাশ) ও চার প্রকার মৃত্যু-এর সমন্বয়ে গঠিত। 'ফানা' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিনাশ [annihilation]; এটা ব্যাপক অর্থবোধক একটি শব্দ। সুফি পরিভাষায় 'ফানা' শব্দটি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অভিধায় ব্যবহৃত হয়; সেগুলো হলো-ফানা ফিল্লাহ, ফানা ফির্ রাসুল ও ফানা ফিশ্ শায়খ। একজন খোদা পথচারীর জন্য 'ফানা ফিশ্ শায়খ' স্তরে অবগাহন ব্যতীত 'ফানা ফির্ রাসুল' ও 'ফানা' ফিল্লাহ স্তরে পৌঁছা সম্ভব নয়। আল্লামা কুশাইরি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) এর মতে, 'মন্দ স্বভাব দূর হওয়ার নামই ফানা। আর সুন্দর স্বভাব অর্জনকে বলে বাকা' (কুশাইরি ২৩৭)। মন্দ স্বভাবের সূতিকাগার হলো নফ্সে আম্মারা বা প্ররোচনা দানকারী প্রবৃত্তি। এতৎপ্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, "নিশ্চয় মানুষের মন মন্দপ্রবণ।" (আল-কুরআন : ১২-৫৩)। আর নফ্সে আম্মারার প্রকৃতি হল-খাও,পিয়ো, ঘুমাও, ফুর্তি করো ও সহবাস করো, মন্দ ও খারাপ কাজে লিপ্ত হও ইত্যাদি। মন্দ স্বভাব ও মন্দ চরিত্রের জন্য প্রধানত দায়ী আকলে মা'য়াশ। ইহার প্রধান উৎস হলো খাদ্য প্রেরণা। আকলে মা'য়াশকে সুফি পরিভাষা মতে তকাজায়ে নফ্স বা কামনা প্রবৃত্তি বলা হয়। এর সংজ্ঞা প্রদানে হোসাইন বলেন, 'এইরূপ হিতাহিত চিন্তা বিবর্জিত উপস্থিত কামনা চরিতার্থের যে প্রবৃত্তি জাগরিত হয় তাকে নাছুতি বা দৃশ্যমান জগতের প্রেরণা আকলে মা'য়াশ বলে' (হোসাইন ৮১)।

ভোগবিলাস, আত্মতৃপ্তি ও আত্মতুষ্টি মানুষের সুপ্রবৃত্তিগুলোর উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। ফলে, মানুষের নফ্সে আম্মারার প্রকৃতিগুলো জাগ্রত ও প্রবল হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সুপ্রবৃত্তিগুলো সুপ্ত হয়ে যায়। তাই ভোগবিলাস, আত্মতৃপ্তি ও আত্মতুষ্টি পরিহার পূর্বক নফ্সে আম্মারার কুপ্রভাব দূরীভূত করার চেষ্টা করা না হলে খোদা পথচারী তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে বিফল মনোরথ হবে। ভোগবিলাস, আত্মতৃপ্তি ও আত্মতুষ্টি হলো 'হাওয়া' (অনর্থ) বা কামনা-বাসনার অন্যতম অনুষঙ্গ। আর 'হাওয়া'র বিপরীত হলো কানাআ'ত বা অল্পে তুষ্টি। এপ্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদিসটি উল্লেখযোগ্য : হযরত জাবির ইবনে আবুদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "অল্পেতুষ্টি হলো একটি ভাণ্ডার, যা কখনও শেষ হয় না।"(কুশাইরি ৪৫৬)। অপর একটি হাদিসে উল্লেখ আছে-হযরত আবু হুরাইরাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তুমি পরহেজগার হয়ে যাও- মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদতগুজার হবে। অল্পে তুষ্ট থাকো- তাতে পরিণত হবে শ্রেষ্ঠ শুকরগুজারে। নিজের জন্য যা পছন্দ করো মানুষের জন্যও তা-ই পছন্দ করো- এতে তুমি সত্যিকারের মু'মিন হবে। প্রতিবেশীর সাথে ভালো আচরণ করো, তুমি হয়ে যাবে সত্যিকার মুসলমান। অল্প হাসো, বেশি হাসলে অন্তর মরে যায়।" (কুশাইরি ৪৫৬)। 'ফানা আনিল হাওয়া'র মূল প্রতিপাদ্য হলো অল্পে তুষ্ট থাকা, অনর্থক কথাবার্তা ও কাজ-কর্ম বর্জন করা। আমাদের জীবন যাত্রাকে সহজ ও ঝামেলামুক্ত করতে 'ফানা আনিল হাওয়া'র চর্চা অপরিহার্য। সেজন্য দেখা যায় 'ফানা আনিল হাওয়া' চর্চাকারী ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত কম ঝামেলায় পতিত হয়। ড. ইউসরি রুশদি (২০২২) বলেন, ফানা'র দ্বিতীয় স্তর হলো 'ফানা আনিল হাওয়া'। নিজের কামনা-বাসনা, নফ্সে আম্মারার খারাপ প্ররোচনা, মন্দ ও নিন্দনীয় চরিত্র যেমন : লোভ-লালসা, হিংসা, প্রতিশোধ প্রবণতা, পৃথিবীর তুচ্ছ বস্তু সংগ্রহে মত্ত হওয়া, তাড়াহুড়ো, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ইত্যাদিকে বিনাশ করা। উপর্যুক্ত মন্দ ও নিন্দনীয় গুণাবলী সম্পর্কে আল্লাহ ইরশাদ করেন, "মানুষ তো সৃজিত হয়েছে ভীরুরূপে । যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়" (আল-কুরআন, ৭০ : ১৯-২১)।

অপরিমিত ভোগবিলাস ব্যক্তির কামনা-বাসনাকে জাগ্রত করে দেয়। ফলে সে অনৈতিক ও অশ্লীল কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে দ্বিধা বোধ করে না। তাই

নিয়মতান্ত্রিক জীবন-যাপন ও অতিরিক্ত ভোগবিলাস পরিহার করে ব্যক্তি সংযম অবলম্বনের মাধ্যমে জীবন-যাপন করলে একদিকে তার খারাপ ও অশ্লীল কামনা-বাসনাগুলো নিয়ন্ত্রিত হবে, অপরদিকে ঝামেলামুক্ত জীবন পরিচালিত করতে পারবে। তাই ইসলামে ভোগবিলাস পরিহার ও সংযম অবলম্বনের উপর গুরত্বারোপ করা হয়েছে। সেই কারণে রোজা বা উপবাসকে সংযম অবলম্বনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এতৎপ্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য : 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস্'উদ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হতে বর্ণিত : তিনি বলেন, হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে, সে যেন অবশ্যই বিবাহ করে। কেননা বিবাহ দৃষ্টি অবনত করে ও লজ্জাস্থানের অধিক হেফাযাত করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন সওম (রোযা) রাখে; কেননা, সওম তার জন্য ঢালস্বরূপ (অর্থাৎ, অবৈধ যৌনচাহিদা থেকে বিরত রাখে) (বুখারি ও মুসলিম) [মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং-৩০৮০] । 'উছুলে ছাবয়া'র একটি উছুল হলো মউতে আবয়ায বা সাদা মৃত্যু, এটা রোজা, উপবাস ও সংযম অবলম্বনের মাধ্যমে হাসিল হয়। তাই অতিরিক্ত ভোগবিলাস নিয়ন্ত্রণে 'মউতে আরবা'কে অন্যতম হাতিয়ার বলা যায়।

হাওয়া বা কামনা-বাসনা নফ্সকে ভোগবিলাসে তাড়িত করে। নফ্সে আম্মারা-র অন্যতম প্রকৃতি হলো আমোদ-ফুর্তি ও ভোগবিলাসে গা ভাসিয়ে দেওয়া। তাই একে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে ব্যক্তির চারিত্রিক অবক্ষয় অনিবার্য। এই প্রসঙ্গে আল্লামা শরফুদ্দিন বুসুরি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, "বিরোধিতা করো নফ্স ও শয়তানের, এবং নাফরমানি করো এই দুইজনের। যদিও তারা উভয়ে ভালো উপদেশ এবং মঙ্গল কামনা করে, তারপরও তাদেরকে আশঙ্কমূল্ক মনে করো।" (কসিদায়ে বুরদা ৯)। মানুষের সুস্পষ্ট শত্রু হলো শয়তান। সে সর্বদা মানুষকে খারাপ কাজে ব্যতিব্যস্ত রাখে। সে মানুষের মধ্যে খারাপ চিন্তা ও ভোগবাদের চিন্তা জাগিয়ে দেয়। মানুষের জন্য কল্যাণকর নয় এমন বস্তুর দিকে তাকে মোহিত করে।

ভোগবাদ ও ভোগবিলাস মানবতার কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই করে চলেছে। ভোগবাদ ও ভোগবিলাস বলতে বস্তুগত ভোগ-বিলাসকে বুঝায়। ভোগবাদ তত্ত্বের জনক হলেন গ্রিক দার্শনিক এপিকিউরাস। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মানব সমাজ যে চিন্তা-চেতনা লালন করে তা হলো বস্তুগত ভোগ-বিলাসের মাধ্যমে সুখ-শান্তি লাভ করা। সেই সাথে যুক্ত হয়েছে

'রোমান্টিকতা' তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য হলো- মন যা চায় তা করা। ভোগবাদ আমাদের করে শারীরিক ও মানসিকভাবে নিষ্পেষিত ও শোষিত। ভোগবাদী চিন্তা-চেতনা মানুষকে শেখায় কীভাবে বিলাসবহুল ফ্ল্যাটের মালিক হওয়া যায়, কীভাবে দামি গাড়ি কেনা যায় ও কীভাবে দামি বিলাসী সামগ্রী ক্রয় করা যায়। ২০১৮ সালের একটি জরিপে দেখা যায়, বিশ্বজুড়ে বিলাসী পণ্যের বাজার ছিল প্রায় ৩২৩, ১৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যার অধিকাংশ পণ্য ছিল কসমেটিকস সামগ্রী, আধুনিক ফ্যাশনের পোশাক, চামড়াজাত পণ্য, ঘড়ি ও জুয়েলারি। এসব বিলাসী পণ্য ক্রয়ে একজন মানুষকে যে পরিমাণ খাটুনি করতে হয়, এরপর তার জীবনকে উপভোগ করার সময় নাই বললে চলে। মানুষের অতিরিক্ত চাহিদা তাকে হাড়ভাঙা খাটুনির দিকে ধাবিত করে। বর্তমানে একজন মানুষকে সপ্তাহে প্রায় ৬০ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হয়। এক্ষেত্রে জাপানিরা নজির স্থাপন করেছে। তারা দৈনিক ৮/৯ ঘণ্টা পরিশ্রম করে এবং ৪/৫ ঘণ্টা ওভারটাইম করে। তাদের এই হাড়ভাঙা পরিশ্রম কেবল ভোগ-বিলাসের জন্য; শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তির জন্য নয়। সেই কারণে দেখা যায় অনেক জাপানিকে সপ্তাহ শেষে মেট্রো স্টেশনে পড়ে থাকতে। কাজের চাপে প্রতি বছর জাপানে ১০ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে। জাপানি ভাষায় এটাকে 'কারোশি' বা কাজের চাপে মৃত্যু বলে আখ্যায়িত করা হয় (খান)।

ভোগবাদ ও ভোগ-বিলাস মানুষকে করে তুলেছে স্বার্থপর, ক্লান্তিহীন, অবিরাম পথচলা। এটা বাড়িয়ে দিয়েছে হতাশা ও মানসিক অশান্তি; কারণ, আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করি আমার প্রতিবেশী ধনী লোকের সাথে পাল্লা দিয়ে অতিরিক্ত খাটুনি করে অথবা অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করতে। যখন সে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়, তখন সে হতাশ হয়ে পড়ে। এই হতাশার কারণে পৃথিবীতে গড়ে ৪০ সেকেন্ডে একজন মানুষ আত্মহত্যা করে এবং বছরে প্রায় ৪০ লাখ। আর বেশিরভাগই তা উন্নত দেশগুলোতে ঘটে। বিশ্বের মধ্যে আরেকটি বড়ো সমস্যা দিন দিন প্রকট হচ্ছে তা হলো খাদ্য সংকট। অথচ উন্নত বিশ্বের লোকেরা বিলাসী পণ্য ক্রয়ে একটু ক্রচ্ছ্র সাধন করলে এই খাদ্য সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব। একটি জরিপে দেখা যায় আমেরিকানরা শুধু বিলাসী জুতা, ঘড়ি এবং অলংকারের পেছনে ব্যয় করে ৭১,৮১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর সারা বিশ্বে খাদ্যের অভাবে প্রতি বছর নয় মিলিয়ন মানুষ মারা যায়; অথচ আমাদের বিলাসিতার জন্য প্রতি বছর ৪০% উৎপাদিত খাবার নষ্ট হয়। নোয়াম